সামাজিক বিজ্ঞান

ইতিহাস ও রাজনীতি বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণী

শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয় এবং
রাজ্যশিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ,
ওড়িশা, ভুবনেশ্বর।

ওড়িশা প্রাথমিক শিক্ষা কার্য্যক্রম প্রাধিকরণ
ভুবনেশ্বর

ইতিহাস ও রাজনীতি বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণী

সম্পাদক মণ্ডলী:
ডঃ শম্ভু প্রসাদ সামন্তরায়
শ্রী বিষ্ণুচরণ পাত্র
শ্রী প্রফুল্ল কুমার জেনা
শ্রীমতী পদ্মাশ্রী মহান্তি

সমীক্ষক মণ্ডলী:
ডঃ শম্ভু প্রসাদ সামন্তরায়
শ্রী বৈষ্ণব চরণ দাস
শ্রী প্রতাপ কুমার পট্টনায়ক
শ্রীমতী রত্নমঞ্জরী দাশ
শ্রীমতী রেণুবালা দাশ
শ্রীমতী পুষ্পাঞ্জলি পানি

সংযোজনা:
ডঃ প্রীতিলতা জেনা
ডঃ তিলোত্তমা সেনাপতি

সংযোজনা:
ডঃ সবিতা সাহু

প্রকাশক:
বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা বিভাগ, ওড়িশা সরকার

মুদ্রণ বর্ষ: ২০২২

মুদ্রণ:
পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিক্রয়, ভুবনেশ্বর

প্রস্তুতি:
শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয়
এবং রাজ্যশিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ ওড়িশা, ভুবনেশ্বর।

জগজ্জননীর চরণে অদ্যাবধি আমি যে সব নৈবেদ্য দিয়েছি, তার মধ্যে মৌলিক শিক্ষা, আমার সবচেয়ে বেশী ক্রান্তিকারী ও মহত্ত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। এর চেয়ে বেশী মহত্ত্বপূর্ণ ও মূল্যবান নিদর্শন আমি যে জগতের সামনে রাখতে পারবো, তা' আমার বিশ্বাস হয় না। এতে রয়েছে আমার সমগ্র রচনাত্মক কার্য্যক্রমকে প্রয়োগাত্মক করার চাবিকাঠি। যে নূতন জগতের জন্য আমি অস্থির হচ্ছি, তা' এর থেকেই উদ্ভব হতে পারবে। এটাই আমার অন্তিম অভিলাষ বললেও চলে।

মহাত্মা গান্ধী

আমাদের জাতীয় সঙ্গীত

''জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত - ভাগ্য - বিধাতা
পাঞ্জাব - সিন্ধু- গুজরাট - মারাঠা
দ্রাবিড় - উৎকল - বঙ্গ
বিন্ধ্য - হিমাচল - যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে
তব শুভ আশীষ মাগে
গাহে তব জয় গাঁথা
জনগণ-মঙ্গল দায়ক জয় হে,
ভারত ভাগ্য বিধাতা,
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।''

সূচীপত্র

অধ্যায়	প্রসঙ্গ	পৃষ্ঠা
প্রথম	ইতিহাসের বিষয়ে ধারনা	১
দ্বিতীয়	সর্ব প্রাচীন সমাজ	১২
তৃতীয়	প্রথম চাষী ও পশুপালন	১৯
চতুর্থ	ভারতের প্রথম নগরীকরণ	২৫
পঞ্চম	বিভিন্ন জীবন ধারণ প্রনালী	৩৫
ষষ্ঠ	নূতন চিন্তাধারার অভ্যুদয়	৪২
সপ্তম	পারস্য ও গ্রীক আক্রমণ	৫২
অষ্টম	মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান	৫৭
নবম	খ্রী: পূ: ২০০ থেকে খ্রী: অ: ৩০০র মধ্যে ভারত	৬৫
দশম	খ্রী: অ: ৩০০ থেকে খ্রী: অ: ৮০০র মধ্যে ভারত	৭৬

রাজনীতি বিজ্ঞান

প্রথম	আমরা ও আমাদের সমাজ	৯৫
দ্বিতীয়	রাষ্ট্র	১০২
তৃতীয়	সরকার	১০৯
চতুর্থ	স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন	১১৭

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

‘‘আমারা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গনতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার; চিন্তা, মত্‌প্রকাশ, বিশ্বাস, ধম এবং উপাসনার স্বাধীনতার; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহন করে, আমাদের গণপরিষদ। আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস বিষয়ে ধারণা

একদিন দাদুর কাছে গল্প শুনতে লিপি জিদ ধরে বসল। দাদু লিপিকে বললেন, 'আমি তোকে আজ একটা নতুন গল্প বলছি, শোন।' লিপি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'শিগগির বলো।' দাদু গল্প বললেন—

গ্রিস দেশে এক শক্তিশালী রাজা ছিল তার নাম আলেকজান্ডার। সে পৃথিবীর অনেক রাজ্য জয় করার পরে ভারত অধিকার করতে চাইল। সেই সময় ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকে যে রাজারা রাজত্ব করতেন তাঁদের মধ্যে দুজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। সে দুজন রাজা হলেন অম্বা ও পুরু। আলেকজান্ডারের ভয়ে তার শরণাপন্ন হলেন অম্বা। কিন্তু বীর রাজা পুরু যুদ্ধ না করে বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকৃত হলেন। তিনি আলেকজান্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। এই যুদ্ধে পুরু হেরে গেলেন ও আলেকজান্ডারের দ্বারা বন্দি হলেন। আলেকজান্ডার পুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমার কাছে কেমন ব্যবহার আশা কর?' পুরু উত্তর দিলেন, 'একজন রাজা অন্য এক রাজার কাছে যেরূপ ব্যবহার আশা করে।' পুরুর নির্ভীকতায় খুশি হয়ে আলেকজান্ডার তাঁকে মুক্ত করে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন।

গল্প শুনে লিপি জিজ্ঞেস করল, দাদু তুমি এত কথা কী করে জানলে? দাদু বললেন, ইতিহাস থেকে। এরপর লিপি দাদুকে ইতিহাস বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল ও দাদু সেসবের উত্তর দিলেন। এসো সে বিষয়ে জানব।

ইতিহাস বলতে কী বোঝায়?

বর্তমান পৃথিবীতে যত মানুষ দেখা যায় সকলের জাতি এক। বৈজ্ঞানিকদের মতে আজ থেকে প্রায় পনেরো লক্ষ বর্ষ পূর্বে পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তার পূর্বে মানুষের রূপ এমন ছিল না। মানুষ সদৃশ বানরের ক্রম বিকাশের ফলে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমান ধরাপৃষ্ঠে সেই প্রকার লাঙ্গুলহীন বানর দেখতে পাওয়া যায় না। সেই জাতির গিবন ওরাংওটাং, গরিলা ও শিম্পাঞ্জীদের এখনও পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যায়। গরিলার শরীরের গঠন ও মানুষের শরীরের গঠন প্রায় এক। এ ছাড়া শিম্পাজীর বুদ্ধির সঙ্গে মানুষের বুদ্ধির মিল দেখা যায়।

তোমার অঞ্চলে দেখতে পাওয়া বানরদের বিষয়ে লেখো।

মানুষের সাংস্কৃতিক ধারা অতি প্রাচীন। সামাজিক রীতিনীতি ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি থেকে মানুষের সংস্কার আরম্ভ হয়েছে বলে জানা যায়। তাছাড়া কৃষিকার্য, আগুনের আবিষ্কার ও ব্যবহার, চাকার উদ্ভাবন, বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার গ্রাম, শহর ও রাজ্যের পরিকল্পনা, শাসন প্রণালী ও পরিচালনা ইত্যাদি বিভিন্ন স্তর দিয়ে মানুষের সংস্কৃতি বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। এই সব অগ্রগতির ধারাবাহিক বিবরণী হল ইতিহাস। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, মানুষের অতীত ঘটনাগুলির নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি হচ্ছে ইতিহাস।

তোমার অঞ্চলের প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি অন্যদের কাছে থেকে জেনে লেখো।

ইতিহাসকে ইংরাজিতে হিস্ট্রি বলা হয়। 'হিস্ট্রি' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'হিস্টো' থেকে এসেছে। এর অর্থ হল অতীত বিষয়ে জানা। অন্য অর্থে ইতিহাস হচ্ছে এক বাস্তব ঘটনাবলি যা প্রাচীনকালে মানুষদের জীবনযাপন প্রণালীর বিষয়ে আলোচনা করে।

ইতিহাস পড়ার উপাদেয়তা কী ?

- ইতিহাস পড়লে আমরা সময়ানুক্রমে অতীতে সংঘটিত ঘটনার বিষয়ে জানতে পারি।
- বর্তমানকে বুঝতে হলে অতীতকে জানা আবশ্যক। অতীতকে জানলে আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ঠিকভাবে গঠন করতে পারব।
- অতীতে মানুষ সুখ শান্তিতে বাস করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করত, সেগুলির মধ্যে কিছু এখনও আমাদের জন্য দরকারী হতে পারে। অতীতের সে উপায়গুলি থেকে দরকারী অংশ বেছে গ্রহণের জন্য ইতিহাস পঠন সাহায্য করে।
- অতীতের বিভিন্ন প্রথা, রাজ্য গঠন, শাসন প্রণালী ইত্যাদির বিষয়ে জেনে যেগুলি আমাদের দরকারী সেগুলি গ্রহণ করতে পারি। এই কার্যে ইতিহাস পঠন আমাদের সহায়ক হয়।
- অতীতের অনেক কুপ্রথা ও অন্ধবিশ্বাস এখনও আমাদের সমাজে প্রচলিত। ইতিহাস অধ্যয়নের দ্বারা সেগুলি কবে, কেন ও কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তা আমরা জানতে পারি এবং বর্তমান যুগে যেগুলি গ্রহণযোগ্য নয় তা আমরা বুঝতে সক্ষম হব। সেগুলির আবশ্যকীয় পরিবর্তন করে বর্তমান যুগের উপযোগী করবার চেষ্টা করব। সুতরাং ইতিহাস পড়া আমাদের একান্ত আবশ্যক।

ইতিহাসের আধার কী ?

ইতিহাস কোনো কাল্পনিক কাহিনী নয়। ইহা প্রমাণ করা যায় এরূপ তথ্য উপরে আধারিত। অনেকগুলি প্রাচীন আধার থেকে আমরা ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি। এই আধারগুলিকে দুই ভাবে বিভক্ত করা যায়। যথা (১) প্রত্নতাত্ত্বিক আধার (২) সাহিত্যিক আধার। উভয় আধারের উপর ভিত্তি করে ইতিহাস সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক আধার

ভারতের বিভিন্ন স্থানে মাটির নীচে ও মাটির উপরে প্রাচীন যুগের বহুবিধ ঐতিহাসিক বস্তু ও অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলি প্রাচীনকালের বিভিন্ন কার্যকলাপ ও ঘটনাবলীর উপর আলোকপাত করে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক আধারগুলিকে চারভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে; যথা- (১) খোদিত লেখা বা লিপি, (২) কীর্তি ও স্থাপত্য শিল্প, (৩) ভৌতিক অবশেষ (Material Remains) এবং (৪) মুদ্রা।

(১) খোদিত লেখা বা লিপি

তালপত্র লিপি

মেসোপটেমিয়া লিপি

অতীতের বিভিন্ন ঘটনা, কার্যকলাপ, শাসন প্রণালী, সামাজিক প্রথা, পরম্পরা ও জীবনযাত্রা ইত্যাদি মাটির টাইল ও ইট, তাম্রপত্র (তাম্রফলক), পশুচামড়া, বস্ত্র, স্তম্ভ, মন্দিরের দেওয়াল, পাথর, গাছের পত্র ও ছাল তথা তালপাতায় লেখা হত। সেগুলি আজও দেখতে পাওয়া যায়। ওড়িশার ভুবনেশ্বর নিকটবর্তী ধউলি পাহাড় ও গঞ্জামের জউগড়ের পাথরের উপরে আজ থেকে প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্বের লেখা দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া ইরান, ইরাক, মিশর, চীন, গ্রীস তথা আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে অতীতের ঘটনাবলী সম্পর্কিত লেখা দেখতে পাওয়া যায়।

(২) কীর্তি ও স্থাপত্য শিল্প

আমাদের দেশে অনেক ঐতিহাসিক কীর্তি যথা— মন্দির, দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, স্তূপ ও মঠ ইত্যাদি দেখা যায়। এসবের নির্মাণ সময় ও নির্মাণ কর্তাদের বিষয়ে আমরা জানতে পারি।

কোণার্ক মন্দির

এছাড়া এসবের তৎকালীন সামাজিক সাংস্কৃতিক, ধার্মিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

উদয়গিরি পাহাড়ের হাতিগুম্ফা

তোমার অঞ্চলে যেসব ঐতিহাসিক স্থান ও কীর্তি রয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

(৩) ভৌতিক অবশেষ

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে অনেক মাটির পাত্র, ধাতুর পাত্র, হস্তনির্মিত হাতিয়ার, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র, মূর্তি ইত্যাদি পাওয়া যায়। এ সব অনুধ্যান করলে অতীতের ঘটনা ও কীর্তি সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

(৪) মুদ্রা

ইতিহাস জানতে প্রাচীন মুদ্রা বিশেষভাবে সাহায্য করে। ইহা কবে কোন শাসকের দ্বারা প্রচলিত হয়েছিল, সেই সময়ের অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ইত্যাদি কেমন ছিল, তৎ-সম্পর্কিত অনেক তথ্য প্রাচীন মুদ্রাগুলি থেকে পাওয়া যায়।

প্রাচীন মুদ্রা

বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা সংগ্রহ করো। সেগুলিতে কী খোদিত হয়েছে, তা লেখো।

সাহিত্যিক আধার

অতীতকালের বিভিন্ন ঘটনা জানার জন্য পুরাতন সাহিত্য আমাদের অনেক সাহায্য করে। এই সাহিত্যিক আধারগুলি তিনভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা— (১) ধর্ম সম্বন্ধীয় সাহিত্য, (২) ঐহিক সাহিত্য, (৩) পরিব্রাজকদের বিবরণী।

(১) ধর্ম সম্বন্ধীয় সাহিত্য

যে সাহিত্যে বিশেষভাবে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলিকে ধর্ম সম্বন্ধীয় সাহিত্য বলা হয়। এই সাহিত্য বিভিন্ন ধর্ম কথার উপরে আধারিত। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থগুলি এই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই ধর্মসাহিত্য থেকে প্রাচীন কালের ধর্ম, সামাজিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক অবস্থার বিষয়ে অবগত হই।

(২) ঐহিক সাহিত্য

ধর্ম সম্বন্ধীয় সাহিত্য ব্যতীত প্রাচীনকালে অনেক প্রকার সাহিত্য রচিত হয়েছিল। এ প্রকার সাহিত্য মধ্যে বিভিন্ন ধর্মসূত্র ও স্তুতি, পাণিনি ও পতঞ্জলির লিখিত ব্যাকরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কালিদাসের রচনাবলী, বাণভট্টের হর্ষচরিত ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে তৎকালীন সমাজ, রীতিনীতি, শাসনপ্রণালী, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

(৩) পরিব্রাজকদের বিবরণী

প্রাচীনকালে অনেক পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁরা সে সময়ের সামাজিক অবস্থা, ধর্ম, রাজ্য শাসন প্রণালী, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা তাঁদের বিবরণীতে লিখে গেছেন। এই সব বিবরণী থেকে আমরা ইতিহাস সম্বন্ধীয় অনেক তথ্য জানতে পারি। এই সমস্ত পরিব্রাজকদের মধ্যে মেগাস্থিনিস, ফা-সিয়াঁ, জুয়াং জাঙ, আলবেরুণী, ইবনবতুতা প্রমুখ অন্যতম। তাদের মধ্যে চীনের পরিব্রাজক জুয়াং-জাঙ ওড়িশা এসেছিলেন।

উপরোক্ত পরিব্রাজকগণ কোন রাজার রাজত্বের সময়ে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন, তাহা সংগ্রহ করে লেখো।

সময় অনুসারে ইতিহাসের শ্রেণীবিভাগ করা যায় কিভাবে?

সময় অনুসারে ইতিহাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। সেগুলি হল- (১) প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ, (২) আদ্য ঐতিহাসিক যুগ (৩) ঐতিহাসিক যুগ।

১. প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ ঃ

বহু পুরাতন কালে লোকেরা লেখাপড়া জানত না। অতএব সে সময়ের ঘটনাবলী লিখিত আকারে পাওয়া যায় না। সুতরাং সে সময়ের লোকেদের জীবনযাপন প্রণালী জানার জন্য ভূগর্ভ খনন ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কৃত

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে পাওয়া মাটিপাত্র

উপকরণের উপরে নির্ভর করতে হয়। সেই সময়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের মাটির পাত্র, অলংকার, হাতে তৈরী হাতিয়ার, অস্থিকঙ্কাল ইত্যাদি দ্রব্য থেকে লোকেদের জীবনযাপন প্রণালীর বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া যায়। সে সময় লোকেরা যে গুম্ফাতে থাকত সেই গুম্ফাতে তারা বিভিন্ন প্রকারের চিত্র আঁকত। সেখান থেকেও আমরা তাদের শিল্পকলা বিষয়ে জানতে পারি। এই যুগকে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ বলা হয়।

২. আদ্য ঐতিহাসিক যুগ ঃ

মানুষ লেখাপড়া শেখার পরে বিভিন্ন ঘটনা নিজের লেখার দ্বারা প্রকাশ করতে শিখল। এই সময়কে আদ্য ঐতিহাসিক যুগ বলা হয়। এই লেখাগুলি সীমিত এবং তার মধ্যে কিছু লেখা পড়া সম্ভব হয়নি। সুতরাং এই সময়ের ঘটনাবলী জানতে হলে লেখাগুলির সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অনুসন্ধানের উপরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। সিন্ধু নদী কূলে এই সময়ে গড়ে ওঠা সভ্যতা তার এক উদাহরণ।

পৃথিবীর আর কোন স্থানে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তথ্য সংগ্রহ করে তার এক তালিকা প্রস্তুত করো।

৩. ঐতিহাসিক যুগ ঃ

লেখার উন্নতি হওয়ার পরে মানুষ বিভিন্ন ঘটনাকে পাথরের প্রাচীর, স্তম্ভ, তাম্রপত্র (তাম্রফলক), তালপত্র, মাটির পাত্র ইত্যাদির উপরে লিখতে শুরু করল। এই লেখাগুলি থেকে সে সময়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা বিষয়ে আমরা অবগত হই। এই সময়কে ঐতিহাসিক যুগ বলা হয়। কিন্তু এই লেখাগুলি অতি পুরাকালের বলে অনেক লেখা নষ্ট হয়ে গেছে।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক কী ?

পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে ভারত অবস্থিত (গ্লোব দেখো)। ইহা এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ উপকূলে প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত। ভারতের দক্ষিণ ভাগকে তিন দিকে সমুদ্র লহরী ঘিরে রয়েছে। সেহেতু একে উপদ্বীপ বলে বলা হয়। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপ থেকে ভারতের দূরত্ব প্রায় সমান। প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ সংঘটিত দেশগুলি ভারতের সীমা সংলগ্ন এবং ভারত থেকে অনতিদূরে অবস্থিত। এই সমস্ত দেশের মধ্যে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চীন, পশ্চিমে ইরানের অবস্থান এবং ইরাক, ইজ্রায়েল, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশ আমাদের দেশের অনতিদূরে অবস্থিত।

ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ

প্রাকৃতিক গঠনের দিক দিয়ে ভারতকে ছটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা— হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, উত্তরস্থ সমতল অঞ্চল, কেন্দ্রস্থ মালভূমি অঞ্চল, পশ্চিমস্থ মরুভূমি, উপকূলস্থ সমতল অঞ্চল, এবং সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপ সমূহ। এদের মধ্যে কেন্দ্রস্থ মালভূমি ও পশ্চিমস্থ মরুভূমি যথাক্রমে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম প্রাকৃতিক অঞ্চল।

ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্র

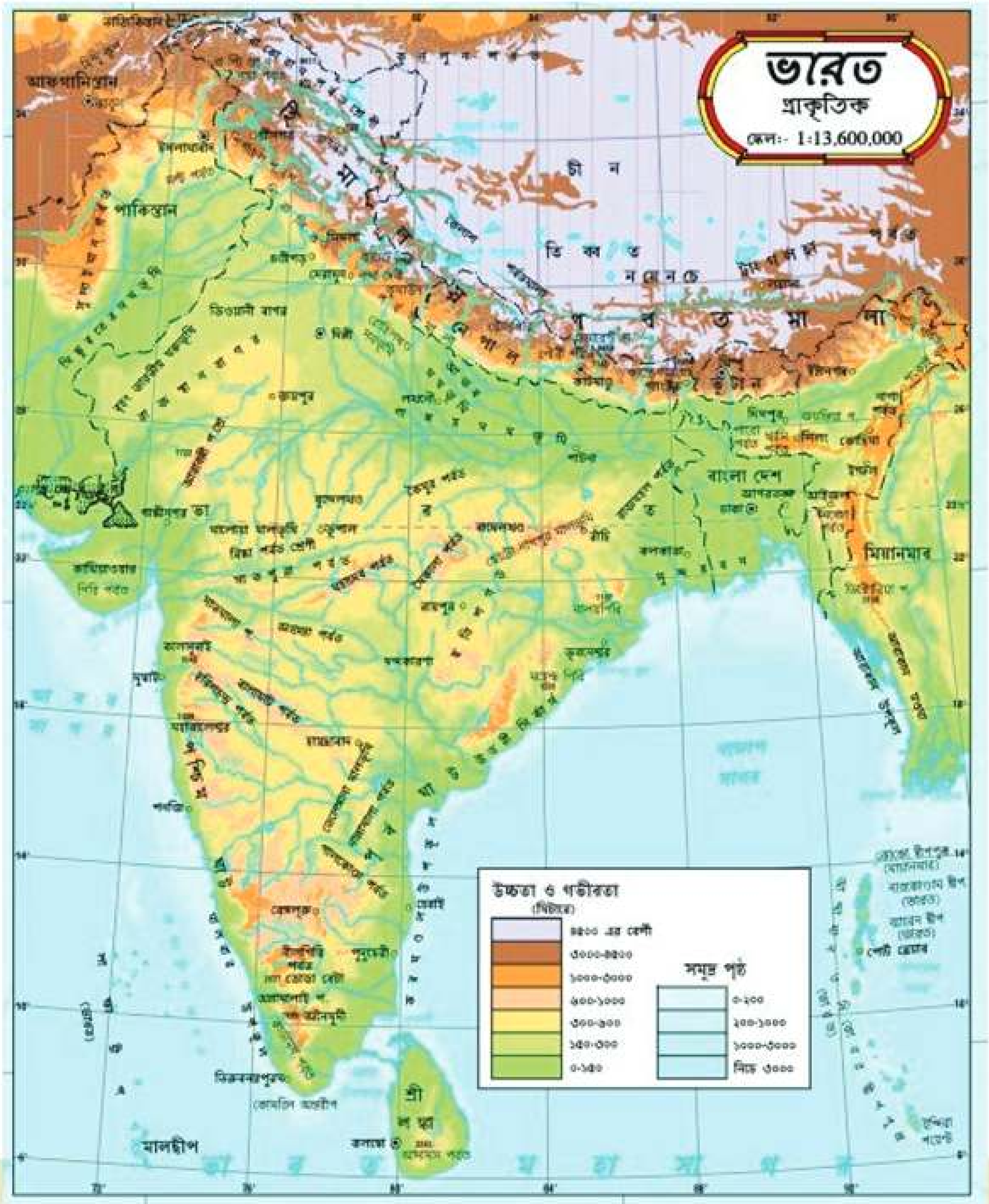

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

ভারতের ইতিহাস তার প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত। ভারতের চারিটি প্রধান প্রাকৃতিক অঞ্চল রয়েছে। সেগুলি হল (১) পার্বত্য অঞ্চল, (২) নদী উপত্যকা অঞ্চল, (৩) অরণ্য, (৪) উপকূলবর্তী সমতল অঞ্চল।

(১) পার্বত্য অঞ্চল ঃ

ভারতের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত অত্যুচ্চ হিমালয় পর্বতশ্রেণী কেন্দ্রীয় এশিয়া থেকে ভারতকে পৃথক করে রেখেছে। হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশের অঞ্চল ও উপত্যকা অঞ্চলের মৃত্তিকা উর্বর এবং জলসম্পদে পরিপূর্ণ। এই সব সুবিধার জন্য এই অঞ্চল কৃষি উপযোগী ও ঘনজনবসতিপূর্ণ।

অত্যুচ্চ হিমালয় পর্বতমালা অতিক্রম করে উত্তর দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করা কষ্টকর। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম দিকের পার্বত্য অঞ্চলে কিছুমাত্রায় সংকীর্ণ গিরিপথ রয়েছে। এই পথ দিয়েই বিভিন্ন সময়ে আক্রমণকারী, ব্যবসায়ী ও পরিব্রাজকের দল ভারতে এসেছে। তাঁদের আসার ফলে তাঁদের চালচলন, দর্শন, ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা আমাদের সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়েছে।

দক্ষিণ ভারত মালভূমির পূর্বপার্শ্বে পূর্বঘাট পর্বতমালা ও পশ্চিমপার্শ্বে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অবস্থিত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ভারতের মধ্যভাগ থেকে দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এ অঞ্চল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল পাহাড়িয়া ও মৃত্তিকা অনুর্বর কিন্তু খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ।

তোমার গাঁ বা শহর ঘিরে যেসব রয়েছে সেগুলি লেখ।

(২) নদী উপত্যকা অঞ্চল ঃ

আমাদের দেশে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমির মধ্যে এক বিস্তীর্ণ সমতল অঞ্চল পূর্ব-পশ্চিম হয়ে বিস্তৃত রয়েছে। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি স্রোতস্বতী নদীগুলির পলিমাটি দ্বারা এই সমতল অঞ্চলের সৃষ্টি। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা উর্বর এবং প্রচুর জল পাওয়ার জন্য এখানে বিভিন্ন শস্য উৎপাদন করা যায়। সেইজন্য এই অঞ্চলে অনেক লোক বাস করে। এই কারণে বহু নদীর তীরে বহু প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

(৩) অরণ্য ঃ

ভারতের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশ এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিমপার্শ্বে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য এই সব অঞ্চলে ঘন অরণ্য দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অঞ্চলেও অরণ্য দেখা যায়। অরণ্য-জাত দ্রব্যের উপরে নির্ভর করে এখানে লোকেরা বাস করে। অরণ্যের শান্ত ও সুন্দর পরিবেশ সভ্যতার বিশেষ করে ধর্ম, দর্শন এবং সাহিত্যের উন্নতির সহায়ক হয়েছে।

(৪) উপকূলবর্তী সমতল অঞ্চল ঃ

আমাদের দেশের পশ্চিমপার্শ্বে আরবসাগর ও পূর্বপার্শ্বে বঙ্গোপসাগর উপকূলে সমতল অঞ্চল দেখা যায়। পশ্চিম উপকূলের সমতল অঞ্চলের চেয়ে পূর্ব উপকূলের সমতল অঞ্চল অধিক প্রশস্ত। পশ্চিম উপকূলস্থ সমতলভূমি গুজরাট থেকে কেরল পর্যন্ত এবং পূর্ব উপকূলস্থ সমতলভূমি ওড়িশা থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। সাবরমতী, মাহী, নর্মদা, তাপ্তি, প্রভৃতি নদীগুলির পলিমাটি দ্বারা পশ্চিম উপকূলস্থ সমতল অঞ্চল গঠিত এবং মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী প্রভৃতি নদীর পলিমাটি দ্বারা পূর্ব উপকূল সমতলভূমি গঠিত। সমুদ্রকূলবর্তী সমতলভূমি অত্যন্ত উর্বর ও কৃষির জন্য খুব উপযোগী। সেইজন্য এ অঞ্চলে ঘন জনবসতি দেখা যায়। উপকূলবর্তী সমতল অঞ্চলে অবস্থিত নদীর মোহানায় অনেক বন্দর গড়ে উঠেছিল। যার ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্যে উন্নতি ঘটেছিল। এই অঞ্চলেও অনেক শহর গড়ে উঠতে দেখা যায়।

ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলবর্তী সমতল অঞ্চলে গড়ে ওঠা শহরের নাম মানচিত্র দেখে তালিকা করো।

অভ্যাস

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর ৫০টি শব্দে দাও।

(ক) "মানুষের অতীত ঘটনার নিরবচ্ছিন্ন ক্রমিক অগ্রগতি হচ্ছে ইতিহাস"—একথা কেন বলা হয়েছে লেখো।

(খ) ইতিহাস কেন পড়ব?

(গ) ইতিহাস জানার বিভিন্ন উপায়গুলি কী?

(ঘ) সময় অনুসারে ইতিহাসকে কত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে?

(ঙ) ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা এর ইতিহাসকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে?

(চ) ভারতের কোন দুটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ পরিমাণে ভারতের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে, কারণসহ তা উল্লেখ করো।

২। নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর ৩০টি শব্দে লেখো।

(ক) প্রাকৃতিক গঠনের বিচিত্রতা অনুসারে ভারতকে ক'টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে তাদের নাম লেখো।

(খ) সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে কারা ভারতে এসেছেন এবং তাঁরা কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে?

(গ) পশ্চিমঘাট পর্বতমালা কোন স্থান থেকে কোথা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং কী কারণে ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ?

(ঘ) সমতল অঞ্চল কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং এখানে কেন বিভিন্ন শস্য উৎপাদন করা হয়?

(ঙ) কী কারণে নদীকূলে প্রাচীন সভ্যতা সকল গড়ে উঠেছিল?

(চ) কোন অঞ্চলে ঘন জনবসতি দেখা যায় ও তার কারণ কী?

৩। নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর এক-একটি লাইনে লেখো।

(ক) কোথায় অনেক বন্দর গড়ে উঠেছিল?

(খ) অরণ্যের শান্ত ও সুন্দর পরিবেশ কী কী ক্ষেত্রে উন্নতির সহায়ক ছিল?

(গ) আমাদের দেশের কোন স্থানে সমতল অঞ্চল দেখা যায়?

(ঘ) কোন সমতল অঞ্চল অধিক প্রশস্ত?

(ঙ) পশ্চিম উপকূলস্থ সমতলভূমি কাহাকে বলা হয়?

(চ) পূর্ব উপকূলস্থ সমতলভূমি কাহাকে বলা হয়?

৪। বন্ধনীর ভেতর থেকে উপযুক্ত শব্দ বা সংখ্যা বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) আজ থেকে প্রায় ——— লক্ষ বৎসর পূর্বে মনুষ্য সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। (১২, ১৩, ১৪, ১৫)

(খ) প্রাচীন কালে ——— পাতার উপরে লেখা হত।
(বট, তাল, কাঁঠাল, শাল)

(গ) সময় অনুসারে ইতিহাসকে ——— ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
(২, ৩, ৪, ৫)

(ঘ) ভারতের — বৃহত্তম প্রাকৃতিক অঞ্চল।
(হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, উত্তরস্থ সমতল অঞ্চল, পশ্চিমস্থ মরুভূমি অঞ্চল, কেন্দ্রস্থ মালভূমি)

৫। রেখাঙ্কিত পদ বা পদগুলি না পালটে ভ্রম সংশোধন করো।

(ক) সিম্পাঞ্জীর ক্রমবিকাশ হয়ে মনুষ্য সৃষ্টি হয়েছে।

(খ) ইতিহাস শব্দটি লাটিন শব্দ হিস্টোর থেকে এসেছে।

(গ) ভুবনেশ্বর নিকটবর্তী রত্নগিরির নিকটে পাথরের উপরে বাইশ শত বৎসর পূর্বের লেখা দেখতে পাওয়া যায়।

(ঘ) বাণভট্ট একজন বৈদেশিক পরিব্রাজক।

(ঙ) আমাদের দেশের পূর্বভাগে আরব সাগর আছে।

৬। নিম্নপ্রদত্ত উত্তরগুলি থেকে যে উত্তরটি ঠিক তার পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(ক) লাঙ্গুলহীন বাঁদরের সম্পর্কীয়—

- বাঘ
- গোসাপ
- উট
- ওরাঙ্ ওটাঙ্

(খ) মানুষের বৌদ্ধিক গুণের সামঞ্জস্য যুক্ত প্রাণী হচ্ছে—

- গরিলা
- সিম্পাঞ্জী
- পাতি বাঁদর
- গীবন

(গ) হর্ষচরিত রচনা করেছিলেন—

- কৌটিল্য
- পতঞ্জলি
- পাণিনি
- বাণভট্ট

(ঘ) এক প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উদাহরণ হচ্ছে—

- উপনিষদ
- মাটির পাত্র
- বেদ
- মহাভারত

(ঙ) ইরান দেশ ভারতের কোন্ দিকে অবস্থিত?

- পূর্ব
- পশ্চিম
- উত্তর
- দক্ষিণ

তোমার কাজ ঃ

বিভিন্ন প্রাচীন শহর বা মন্দিরের চিত্র সংগ্রহ করে সেগুলি কেন প্রসিদ্ধ লেখো।

সর্বপ্রাচীন সমাজ

এক জন শিক্ষক বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রকে নিয়ে এক সংগ্রহালয়ে গিয়েছিলেন। সংগ্রহালয়ের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ ছাত্রছাত্রীরা ঘুরে দেখবার সময় একটি প্রকোষ্ঠে অনেকগুলি পাথর বিভিন্ন কাঁচের বাক্সর ভিতরে যত্নের সঙ্গে রাখা হয়েছে দেখতে পেল। তা দেখে বিকাশ শিক্ষককে প্রশ্ন করল, ''স্যার, এই সাধারণ পাথরগুলি এত যত্নের সঙ্গে রাখা হয়েছে কেন?'' একথা শুনে শিক্ষক বললেন,

''আজ থেকে প্রায় পনেরো লক্ষ বর্ষ পূর্বে নরাকার বাঁদর থেকে আদিম মানবের উৎপত্তি হল। তাদের বুদ্ধি কেবল খাদ্য সংগ্রহ ও নিজের সুরক্ষা পর্যন্ত সীমিত ছিল। ক্ষুধার উপশমের জন্য জীবজন্তুকে মেরে তার কাঁচা মাংস খেত। এক স্থানে শিকার বা ফলমূলের অভাব হলে অন্য স্থানে যেত। বস্ত্রের ব্যবহার তারা জানত না। কাজেই উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াত। কথা বলতে জানত না। বিভিন্ন ইশারা বা সংকেতের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত। এই ভাবে যাযাবর জীবনযাপন তাদের পক্ষে কষ্টকর ও বিপদপূর্ণ ছিল।

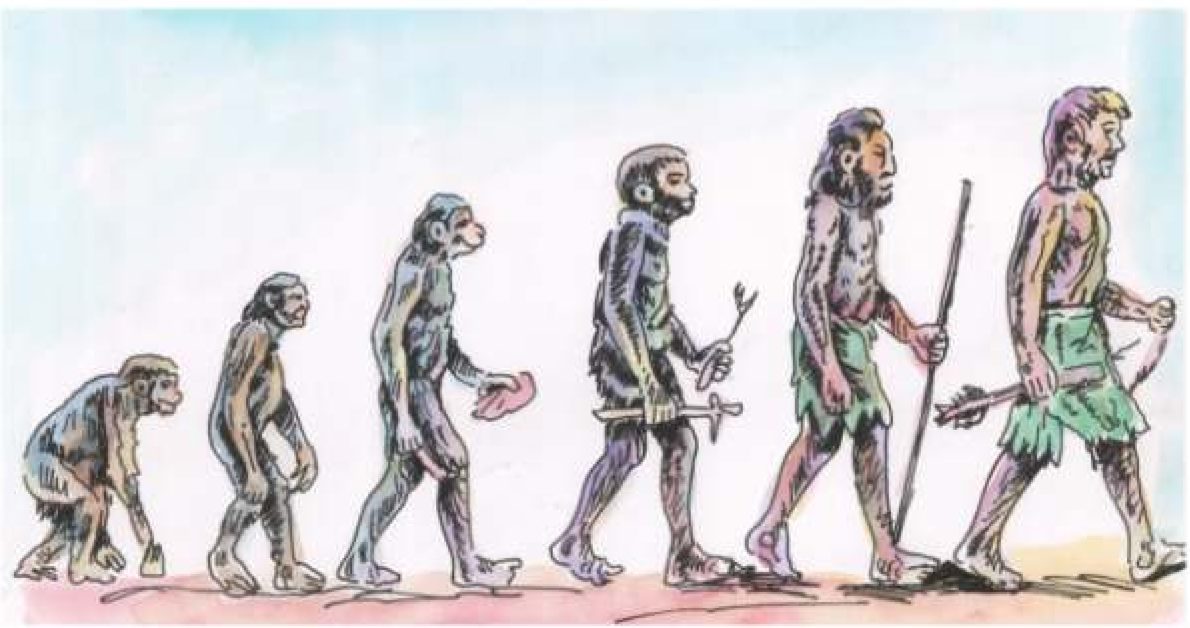

মানুষের ক্রমবিকাশ

বনমানুষ ও বর্তমানের মানুষদের মধ্যে কী কী পার্থক্য লক্ষ্য করছ, লেখো।

নিজের জীবন সুরক্ষিত রাখতে সে পাথর ভেঙে অস্ত্র তৈরি করতে শিখল। বহুদিন ধরে পাথরই ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র। কাজেই এ যুগকে 'প্রস্তর যুগ' বলা হয়। প্রস্তর নির্মিত হাতহাতিয়ার ব্যবহার হেতু এ যুগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা ঃ (ক) পুরাতন প্রস্তর যুগ (খ) নূতন প্রস্তর যুগ।

(ক) পুরাতন প্রস্তর যুগ ঃ

পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ ও নিরাপত্তার জন্য প্রস্তরই তাদের একমাত্র মাধ্যম ছিল। তাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রগুলি চিক্কণ বা সুন্দর ছিল না। সেই কারণে এ যুগকে পুরানো প্রস্তর যুগ বলা হয়। নিজের খাদ্যসংগ্রহ ও যাযাবর জীবনযাপনের জন্য এ যুগের মানুষকে কয়েকটি বিষয় অবলম্বন করতে হত। প্রথমত, যে স্থানে তারা কিছুকাল বসবাস করত, সেই অঞ্চলে ফলমূল ও শিকারের অভাব হলে তারা সে স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যেতে বাধ্য হত। দ্বিতীয়ত, ঋতু অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন গাছে ভিন্ন ভিন্ন ফলমূল পাওয়া যেত। তাই ঋতু পরিবর্তন অনুসারে তারা স্থান পরিবর্তন করত। তৃতীয়ত, প্রচুর জল ও উর্বর চারণভূমির জন্য নদীতীর পশুপক্ষীদের বাসস্থলী ছিল। কাজেই পশু শিকারের জন্য এরা এক নদীকূল থেকে অন্য নদীকূলে বিচরণ করত।

আদিমানবেরা কেন পাথরের তৈরি হাতহাতিয়ার ব্যবহার করত, চিন্তা করে ফেলো।

হাতহাতিয়ার ঃ

পাঞ্জাবের সোন নদী, উত্তরপ্রদেশের বিলা নদী উপত্যকা ও দাক্ষিণাত্য মালভূমির কিছু স্থান থেকে সে সময়ের তৈরি পাথরের কুড়াল, কাস্ক, বর্শা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি তারা খনন, ছেদন, ছেঁচন ও শিকার প্রভৃতি কার্যে ব্যবহার করত বলে অনুমান করা যায়। তাদের অস্ত্রশস্ত্র সুন্দর বা চিক্কণ না হলেও এই অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তারা সহজে জীবজন্তু শিকার করতে পারত ও গাছের বাকল ছাড়াতে পারত এবং পশুদের ছালচামড়া ছিঁড়তে পারত। পরবর্তী সময়ে এক শক্ত পাথরের সন্ধান পেল। এই পাথর পিটন, ছেদন ও ঘর্ষণ কার্যে ব্যবহার করতে শুরু করল। চেন্নাইয়ের নিকটে শক্ত পাথর নির্মিত সে যুগের হাতুড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে।

পুরাতন প্রস্তর যুগের হাতহাতিয়ার

বস্ত্র ও বাসগৃহ ঃ

পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করত ও খাদ্যের জন্য

প্রকৃতির উপর নির্ভর করত। খিদে পেলে খেত। শীত ও গরম থেকে বাঁচার জন্য কৌশল তাদের জানা ছিল না। কালক্রমে সে পশুচামড়া বা বল্কল বস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে শিখল। জীবজন্তুদের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য গাছের কোটর ও পাহাড়ের প্রাকৃতিক গুম্ফাতে আশ্রয় নিত।

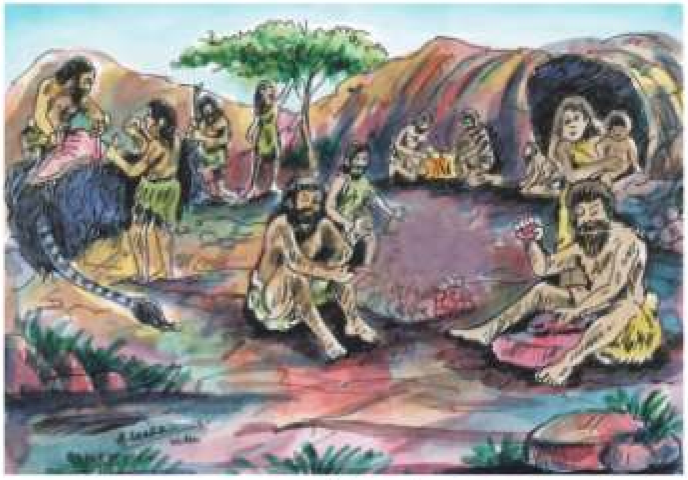

আদিম মানুষ

আগুনের ব্যববহার ঃ

এ যুগের মানুষ প্রথমে পাথরের সঙ্গে পাথর ঘষা লেগে আগুন বেরোতে দেখল। সেই আগুন গাছ, পাতা ও ডাল পুড়িয়ে ছাই করে দেবার শক্তি দেখল। তা দেখে আগুনের ব্যবহারের জন্য এই কৌশল সে অবলম্বন করল। আগুনের ব্যবহার তার জীবনপ্রণালীতে পরিবর্তন আনল।

আগুনের উদ্ভাবন

১। আগুনের সাহায্যে শীতের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেল।

২। আগুনের আলোর সাহায্যে নিজেকে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারল।

৩। আগুনে শিকার করে আনা পশুর মাংস পুড়িয়ে খেতে শিখল। কাঁচা মাংসের চেয়ে পোড়া মাংসের স্বাদ যে অনেক ভালো, তা জানতে পারল।

দাক্ষিণাত্যের কিছু গুম্ফায় পাঁশের গাদা দেখে অনুমান করা যায় যে, এ যুগের মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত।

চিত্রকলা ঃ

বিভিন্ন গুম্ফা বা গুহায় এ যুগের মানুষদের ব্যবহৃত চিত্রকলার সন্ধান পাওয়া গেছে। ফ্রান্স, স্পেন, ইটালি ও জার্মানির বিভিন্ন গুহা ও পাহাড়ে বিভিন্ন পশুপক্ষী, বলগাহরিণ শিকার, ধাবমান বনমহিষ প্রভৃতি চিত্র অঙ্কনের ছবি আছে। ওড়িশার গুড়হান্ডি, বিক্রমখোল, মানিকজোড়া, যোগীমঠ ইত্যাদি পাহাড়ে এই চিত্রকলা দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের কিছু অঞ্চলে আদিবাসীরা আজও শিকার করে ও ফলমূল সংগ্রহ করে যাযাবর জীবনযাপন করছে। কেরলের পাণ্ডারাম, ওড়িশার কোরাপুটের বন্ডা জাতির আদিবাসীরা সেই প্রাচীন সংস্কৃতি আঁকড়ে আজও বেঁচে রয়েছে।

আদিম মানুষের চিত্রকলা

নূতন প্রস্তর যুগ ঃ

হাজার হাজার বছর যাযাবর জীবনযাপন করার পরে মানুষ স্থায়ীরূপে বসবাস করতে আরম্ভ করল। হঠাৎ একদিন আকস্মিকভাবে সে লক্ষ্য করল, বীজ মাটির ভিতরে পোঁতার পরে জল পেয়ে গাছে পরিণত হচ্ছে। এর থেকে হল কৃষির সূত্রপাত। খাদ্য সংগ্রহের জন্য তাকে আর বাইরের উপর নির্ভর করতে হল না। কালক্রমে সে নদীকূলে কুঁড়েঘর তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল। পরবর্তী সময়ে গম, যব, ধান, ফল, শাকসবজি চাষ করতে শিখল।

পশুপালন ঃ

কৃষিকার্যে সাহায্য করার জন্য এ যুগের মানুষ প্রথমে পশুপালন আরম্ভ করল। প্রথমে শিকারের জন্য কুকুর পালন করল। তারপরে গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি পশুপালন করল। ঘোড়া ও গাধাদের পরবর্তী সময়ে মাল পরিবহন কার্যে লাগাল। নদীকূলে প্রচুর জল ও উর্বর মাটি পাওয়াতে শস্য উৎপাদন করতে তাদের সুবিধা হল। পশুপালনের ফলে তাদের অনেক উপকার হল।

নূতন প্রস্থর যুগের পশশুপালন

- পশুদের কাছ থেকে দুধ ও মাংস খাদ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহার করল।
- পোশাক তৈরি করার জন্য পশুচামড়া ও ভেড়ার লোম ব্যবহার করল।
- গাধা, ঘোড়া ও বলদকে মাল পরিবহনের কাজে ব্যবহার করল।
- পশুদের গোবরকে সাররূপে কৃষিকার্যে ব্যবহার করল।

চাকার ব্যবহার ঃ

চাকার ব্যবহার নূতন প্রস্তর যুগের লোকেদের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। এর ফলে তারা বিভিন্ন প্রকারের মাটির পাত্র নির্মাণ করতে পারল। কালক্রমে চাকাকে গাড়িতে ব্যবহার করে মাল পরিবহন শীঘ্র ও সুবিধাতে করতে পারল। পরবর্তী সময়ে এই চাকা তাদের তাঁত প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সাহায্য করল। যার ফলে তারা সূতা কাটতে ও কাপড় তৈরি করতে পারল।

বর্তমান যুগে চাকাকে আমরা কী কী কার্যে ব্যবহার করি, তার একটা তালিকা প্রস্তুত করো।

মাটির পাত্র ঃ

ভারতের কিছু অঞ্চল থেকে এ-যুগের লোকদের ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের মাটির পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি তারা প্রস্তুত করত ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করত। এই পাত্রগুলি তারা রান্না ও শাকসবজি সাজিয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করত বলে অনুমান করা যায়।

হাততৈরি হাতিয়ার ঃ

নতুন প্রস্তর যুগের মানুষদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রগুলি পুরাতন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা অনেক উন্নত, সুন্দর, ধারালো ও চিক্কণ ছিল। কাজেই এই যুগকে নতুন প্রস্তর যুগ নামে নামিত করা যায়। শিকার ব্যতীত অন্যান্য কার্যেও এই অস্ত্রশস্ত্রগুলো ব্যবহার করা হত। পাথর অস্থির হাতলযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র, বাঁশের ধনুক ও পাতের তৈরি গুন প্রভৃতি তারা ব্যবহার করতে জানত এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এছাড়া হাড়ের তৈরি ছুঁচ যে তারা ব্যবহার করত তার সূচনা পাওয়া যায়। চামড়া থেকে নির্মিত বস্ত্র সেলাই করার কাজে তা ব্যবহৃত হত। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার কুচেই, কুফিয়ণা, বইদিপুর প্রভৃতি জায়গা থেকে নতুন যুগের হাততৈরি হাতিয়ারের সমধান পাওয়া গেছে।

নূতন প্রস্থর যুগের হাতহাতিয়ার

অস্ত্রশস্ত্রগুলি চিক্কণ ও ধারালো করার জন্য সে যুগের লোকেরা পাথরকে কি করত লেখো।

ধর্মবিশ্বাস ঃ

নতুন প্রস্তর যুগের লোকেরা প্রকৃতির উপাসক ছিল। তাই প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ যেমন নদী, পর্বত, সূর্য, বৃক্ষ, প্রভৃতির পূজা করত। তারা পরজন্মে বিশ্বাস করত। মানুষ মারা গেলে তার সঙ্গে তার ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্য ও হস্তনির্মিত হাতিয়ার পুঁতে দিত।

কালক্রমে এ যুগের মানুষ গোষ্ঠীগত বা দলগত জীবনযাপন করতে শুরু করল। অবসর সময়ে নিজেকে বিভিন্ন প্রকার সংঘবদ্ধ জীবনের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করল। নিজ নিজ দলের মধ্যে একজনকে দলপতিরূপে বেছে নিল ও তার নির্দেশ মেনে চলল। এই ভাবে সময়ের তালে ছন্দে নিজেকে মিশিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে সভ্যতার দ্বারদেশে এসে পৌঁছল।

অভ্যাস

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর ৫০টি শব্দের মধ্যে দাও।

ক) পুরাতন প্রস্তর যুগের লোকেদের জীবনযাপন প্রণালী কিরূপ ছিল?

খ) আগুনের ব্যবহার জানার দ্বারা পুরাতন প্রস্তর যুগের লোকেরা কিভাবে উপকৃত হল?

গ) পুরাতন প্রস্তর যুগের লোকেরা হস্তনির্মিত হাতিয়ার কী কী কার্যে ব্যবহার করত?

ঘ) নূতন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র ও পুরাতন যুগের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে পার্থক্যগুলি চিহ্নিত কর।

ঙ) আদিমানব কোন পশুদের পালন করত ও তাদের কাছ থেকে কী প্রকার সুবিধা পেত?

চ) মানুষ প্রথমে নদীকূলে বসবাস করতে আগ্রহী হল কেন?

২। নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর ৩০টি শব্দের মধ্যে লেখো।

ক) নূতন প্রস্তর যুগের লোকেরা কী প্রকার কৃষিকাজ আরম্ভ করল ও কিসের চাষ করল?

খ) চাকার ব্যবহার করে নূতন প্রস্তর যুগের লোকেরা কী কী কার্য করল?

গ) পুরাতন প্রস্তর যুগ ও নূতন প্রস্তর যুগের লোকেদের মধ্যে কি পার্থক্য ছিল?

ঘ) পুরাতন প্রস্তর যুগের লোকেরা এক নদীকূল থেকে আর একটি নদীকূলে যেত কেন?

ঙ) নূতন প্রস্তর যুগের লোকেরা প্রকৃতির উপাসক ছিল বলে জানবে কী করে?

৩। নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর এক একটি লাইনে লেখ।

ক) আদিমানব তার বাসস্থান বারবার পরিবর্তন করতকেন?

খ) ক্ষুধার জ্বালা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আদিমানব কী করত?

গ) আদিমানব ঋতু পরিবর্তন অনুসারে কেন স্থান পরিবর্তন করত?

ঘ) নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পুরাতন প্রস্তর যুগের লোকেরা কী ব্যবহার করত?

ঙ) ভারতের কোন কোন স্থানে প্রস্তর যুগের হস্তনির্মিত হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে?

চ) শক্ত পাথরের সন্ধান পাওয়ার পর আদি মানব তা কোন কাজে ব্যবহার করত?

ছ) আদি মানব কোন কোন জিনিস বস্ত্ররূপে ব্যবহার করত?

জ) জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আদিমানব কোথায় আশ্রয় নিত ?

ঝ) ওড়িশার কোন কোন স্থানে আদিমানবের ব্যবহৃত চিত্রকলার সন্ধান পাওয়া যায় ?

ঞ) ওড়িশার কোন স্থানে নূতন প্রস্তর যুগের হস্তনির্মিত হাতিয়ার পাওয়া গেছে ?

৪। বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো।

ক) পুরাতন প্রস্তর যুগের লোকেদের চিত্রকলার সন্ধান — পাওয়া গেছে। (পাথর, গুম্ফা, পাহাড়, কুঁড়েঘর)

খ) বর্তমান কেরলের — রা যাযাবর জীবনযাত্রা করছে। (পাণ্ডারাম, বণ্ডা, পরজা, জুয়াঙ্গ)

গ) নূতন প্রস্তর যুগের লোকেরা মাল পরিবহনের জন্য — ব্যবহার করত। (মহিষ, ঘোড়া, হাতি, হরিণ)

ঘ) প্রস্তর যুগের মানুষ চাকার ব্যবহার — কার্যে সাহায্য করত। (কৃষি, শিকার, পরিবহন, গৃহনির্মাণ)

ঙ) মানুষ প্রথমে — স্থানে স্থায়ীরূপে বাস করতে শিখল। (পার্বত্য অঞ্চল, নদীকূল, বনজঙ্গল, বরফাবৃত অঞ্চল)

৫। 'ক' স্তম্ভের প্রদত্ত শব্দের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের উপযুক্ত শব্দ বেছে যোগ করো।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
গুম্ফা	পোশাক
কুকুর	সার
পশু চামড়া	শিকার কার্য
গোবর	পরিবহন
চাকা	আশ্রয়

তোমার জন্য কাজ ঃ

বর্তমান যুগে চাকা আমরা কী কী কাজে ব্যবহার করি, তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম চাষী ও পশুপালন

বাবার সঙ্গে আলোক একবার রেলগাড়িতে যাওয়ার সময় রাস্তায় অনেক গোরু, ছাগল, ভেড়া চড়তে ও তাদের পাহারা দিতে রাখালদের দেখল। তাছাড়া মাঝে মাঝে চাষ জমি দেখতে পেল। এ সব বিষয়ে জানতে আগ্রহী হয়ে আলোক তার বাবাকে অনেক প্রশ্ন করল। বাবা তার উত্তরে যা বলল, এসো জানব।

আজ থেকে প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) বৎসর পূর্বে ইস্রায়েলের জ্রেরিকো নামক জায়গার অধিবাসীরা প্রথমে কৃষিকাজ আরম্ভ করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রায় ১২,০০০ (বারো হাজার) বৎসর পূর্বে পৃথিবীর জলবায়ুতে বিরাট পরিবর্তন দেখা গেল। জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান লাভ করল। এসব নূতন প্রস্তর যুগের ঘটনা। লোকেরা যাযাবর জীবনযাত্রা ছেড়ে এক স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করল।

লোকেরা এক স্থানে বসবাস করার দরুন কি কি উপকার হল, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

কৃষিকার্য কি করে আরম্ভ হল, সে বিষয়ে ঠিকভাবে জানা যায়নি মানুষ ফল থেকে বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হতে দেখার পরে নিজে সে কাজ আরম্ভ করে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হয়। কৃষিকার্য করার ফলে লোকেরা বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপাদন করল। গম ও যবের চাষ প্রথমে আরম্ভ হল। নূতন প্রস্তর যুগে কাস্তের সন্ধান পাওয়া থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ফসল কাটার কার্যে তা ব্যবহার করা হত। কৃষিকার্যের জন্য লোকেরা আর স্থান পরিবর্তন না করে এক স্থানে ঘর তৈরি করে বসবাস করতে চাইল।

তোমার অঞ্চলে কৃষিকাজ করার জন্য যে যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হয়, তার তালিকা প্রস্তুত করো।

জলবায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য ঘাস জাতীয় গাছ দেখা গেল। হরিণ, ছাগল, ভেড়া, গাইগরু প্রভৃতি পশু সেখানে ধীরে ধীরে আশ্রয় নিতে শুরু করল। চাষ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা পশুপালন করতে লাগল।

কুকুরকে প্রথমে পোষা প্রাণীরূপে রাখা হল। তারপরে মানুষেরা শুয়োর, ছাগল, ভেড়া, গাই, গাধা প্রভৃতি পুষতে শুরু করল। পশুদের আবশ্যকতা বুঝতে পেরে তাদের একসঙ্গে রাখল। গৃহপালিত পশুদের হিংস্র জন্তুদের কাছ থেকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হল। ফলে পশুপালন এক নিয়মিত কার্যরূপে পরিগণিত হল।

অনেক পশুপক্ষী আমাদের উপকার করে। তাদের যত্ন ও সুরক্ষার জন্য তুমি কী করতে পারবে লেখো।

ভারতে নূতন প্রস্তর যুগ অনেক পরে আরম্ভ হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। ভারতের নূতন প্রস্তর যুগে লোকেদের বসবাস করা অঞ্চলগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে। দক্ষিণ ভারত ও পূর্বভারতে নূতন প্রস্তর যুগ উত্তর ভারতের চেয়ে পরে আরম্ভ হয়েছে বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

এই সময় ব্যবহৃত হস্তনির্মিত হাতিয়ারগুলি চিক্কণ, সুন্দর ও ধারালো ছিল। পশুদের হাড়েও অস্ত্রশস্ত্রও নির্মাণ করা হত। বাঁটযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রও ব্যবহার করা হত। বিভিন্ন মাটির পাত্র তৈরি করা লোকেদের অন্য আর এক বৃত্তি ছিল। লোকজন খাদ্যশস্য, পানীয় জল, পশুদের দুধ পরিপাটি করে রাখা ও খাদ্যদ্রব্য রান্নার জন্য বিভিন্ন আকারের মাটির পাত্র ব্যবহার করা হত। প্রথমে হাতে মাটির পাত্র তৈরি করা হত। পরে কুমোর চাকার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের মাটির পাত্র নির্মাণ করল। মাটির পাত্রগুলি সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চিক্কণ ও চিত্রিত করা হত।

নূতন প্রস্তর যুগের শেষভাগে এক বড় পরিবর্তন এল। প্রস্তর নির্মিত ও পশুদের অস্থি দিয়ে প্রস্তুত বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করার সঙ্গে লোকেরা ধাতুর ব্যবহার বিষয়ে জানতে পারল। প্রথমে মানুষ শুধু তামা ধাতুর ব্যবহার করত। এখন তামার সঙ্গে টিন ও দস্তা মিশিয়ে ব্রোঞ্জ বা কাঁসা ধাতু তৈরি করা হল। এই যুগকে তাম্র প্রস্তর যুগ বলা হয়। এই যুগে প্রস্তর ও ধাতু উভয়েরই হস্তনির্মিত হাতিয়ারের ব্যবহার শুরু হল। কর্ণাটকে মহীশূর নিকটস্থ ব্রহ্মগিরিতে এই ধাতুতে নির্মিত ছুরি বা হাতুড়ি দেখতে পাওয়া গেছে।

তাম্র ও কাঁসা আমরা কী কী কার্যে ব্যবহার করি, অনুধ্যান করে লেখো।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে খনন করে প্রথমে কৃষিকার্য করত এমন লোকেদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পোড়া শস্য, গম, যবের সঙ্গে মুসুরজাতীয় কতক ডালের অবশিষ্টাংশ জম্মু ও কাশ্মীরের বুরজাহম ও পাকিস্তানের মেহেরগড়ের নিকটে আবিষ্কৃত হয়েছে।

মেহেরগড়

পাকিস্তানের অন্তর্গত মেহেরগড়ের নিকটে লোকেরা প্রথমবারের জন্য কৃষিকার্য ও স্থায়ীভাবে বসবাস করবার উদ্যোগ করেছিল। এখানে লোকজন গ্রাম স্থাপন করে বসবাস করতে লাগল। পোড়া শস্য ও বিভিন্ন পশুদের অস্থি এখানে পাওয়া গেছে। প্রায় খ্রীঃ পূঃ ৭০০০ বর্ষ পূর্বে এখানে কৃষিকাজ, পশুপালন ও স্থায়ীভাবে বসবাস করার কথা জানা গেছে।

মেহেরগড়ের ঘরগুলি অতি সাধারণ। মাটি দিয়ে সে ঘর নির্মিত। ঘরগুলি তৈরি হয়েছিল বর্গাকার অথবা সমকোণ বিশিষ্ট চতুর্ভুজ আকারে। সেখান থেকে পাথরের হাতুড়ি, ঝিনুক দিয়ে নির্মিত অলংকার, চুনাপাথর, নীলকান্ত মণি, গাঢ় নীলবর্ণ পাথর ও বালিপাথর ইত্যাদি আবিষ্কার করা গেছে। প্রথম দিকে মাটির পাত্রের ব্যবহার কম ছিল। কিন্তু কালক্রমে তাহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হত। কাঁচের মালা পর্যন্ত তৈরি করা হত। মাটির পাত্রগুলি চিত্রাঙ্কন দ্বারা শোভিত করা হত। সেখান থেকে শুয়োর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুদের অস্থি উদ্ধার করা হয়েছে।

তোমার গ্রামের অথবা তোমার দেখা গ্রামের দৃশ্য বর্ণনা করো।

এই যুগে মৃত ব্যক্তিদের সমাধিস্থ করা হত। কাজেই সেই সময়ে অনেক কবর দেখতে পাওয়া যায়। মৃতদেহ যত্নের সঙ্গে সৎকার করা মেহেরগড়ের লোকজনদের এক বিশেষত্ব। মৃত্যুর পরে জীবন ফিরে আসতে পারে বোধহয় এ বিশ্বাস তাদের ছিল। তাই মৃতদেহ তারা যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সমাধিস্থ করত। মৃতদেহের মত পশুদেরও কবর দেওয়া হত। কতকগুলি কবর থেকে কুকুরের অস্থি পাওয়া গেছে।

বুরজাহম

অধুনা জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে প্রায় ২০ কিমি দূরে অবস্থিত বুরজাহমের নিকটে নূতন প্রস্তর যুগের এক বসতি ছিল। এখানকার লোকেরা গর্ত খুঁড়ে ঘর তৈরি করত, যাকে আমরা 'গর্তগৃহ' বলব। মাটিতে থাকা প্রবেশ দরজার আকার গোলাকার হওয়ার দরুন সিঁড়ির সাহায্যে নীচে নামার ব্যবস্থা ছিল। পোড়া পাঁশ, কাঠকয়লা ও চিক্কণ পাত্রের ভগ্নাবশেষ সেই স্থানে দেখতে পাওয়া যায়।

গর্তগৃহ

শীতের কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা সেই গর্তগৃহে থাকত। অস্থিতে নির্মিত বিভিন্ন হস্তনির্মিত হাতিয়ার এখানে পাওয়া গেছে।

উত্তর পূর্ব ভারতে নূতন প্রস্তর যুগের সূচনা

ভারতের উত্তর পূর্ব ভাগের কিছু স্থানে নূতন প্রস্তর যুগের বসতি স্থান আবিষ্কার করা গিয়েছে। তাদের মধ্যে অসমে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চল অন্যতম। অসমের দুজালি হাড়িং নূতন প্রস্তর যুগের এক প্রসিদ্ধ স্থান। এখান থেকে চিক্কণ পাথরে নির্মিত হস্তনৈরী হাতিয়ার, মাটির পাত্র, রান্নার উপকরণ সামগ্রী প্রভৃতি অনেক জিনিস আবিষ্কার করা হয়েছে। জেড্ নামক একটি মূল্যবান পাথর চিন থেকে আমদানী করা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। দেহাবশেষ থেকে তৈরি বিভিন্ন হস্তনির্মিত হাতিয়ার এখানে পাওয়া গেছে। পেষণযন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে।

রান্নাকরা ও খাদ্যশস্য পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখার জন্য অনেক মাটির পাত্র ব্যবহার করা হত। মেঘালয়ের অন্তর্গত গারো পর্বতমালা এবং ত্রিপুরায় কিছু স্থানে নূতন প্রস্তর যুগের অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

এসব থেকে জানা যায় যে এক গ্রামীণ সভ্যতা ভারত ও পাকিস্তানের কয়েকটি স্থানে বিকাশ লাভ করেছিল। তারপরে শহুরে সভ্যতা আরম্ভ হল।

নূতন প্রস্তর যুগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ

অভ্যাস

১। নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর ৫০টি শব্দে দাও।

ক) জলবায়ুতে তাপমাত্রার পরিবর্তন লোকেদের জীবনযাত্রার প্রণালী কে কীভাবে প্রভাবিত করে?

খ) নূতন প্রস্তর যুগের শেষভাগে কী প্রকার পরিবর্তন হয়েছিল?

গ) গ্রামীণ সভ্যতা প্রথমে পাকিস্তানের কোন স্থানে গড়ে উঠেছিল? এই তথ্যের সপক্ষে কয়েকটি সূচনা প্রদান করো।

ঘ) উত্তর-পূর্ব ভারতে কী প্রকার নূতন প্রস্তর যুগের সূচনা পাওয়া গেছে?

২। সংক্ষেপে উত্তর ৩০টি শব্দে দাও।

ক) আদিমানব কেমন করে চাষী ও পশুপালক হয়েছিল?

খ) মেহেরগড় থেকে নূতন প্রস্তর যুগ বিষয়ে কি জানলে?

গ) কী কী ধাতুর ব্যবহার মানুষ প্রথমে জানতে পারল?

ঘ) বুরজাহমে আবিষ্কৃত নূতন প্রস্তর যুগ সম্বন্ধে লেখো।

৩। একটি কিংবা দুটি বাক্যে উত্তর দাও।

ক) নূতন প্রস্তর যুগে কী কী পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল?

খ) আদিমানব কৃষিকার্য কিভাবে আরম্ভ করল?

গ) কৃষিকার্যের উপকারিতা কি ছিল?

ঘ) তৃণ জাতীয় গাছের সৃষ্টি হওয়ার পরে কি পরিবর্তন এসেছিল?

ঙ) তাম্র প্রস্তর যুগ বলতে কী বোঝ?

চ) বুরজাহম-এর গর্তগৃহ কেন ব্যবহৃত হত?

ছ) কোথায় দেহাবশেষ থেকে নির্মিত নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে?

জ) আসাম ব্যতীত ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আর কোন দুটি স্থানে নূতন প্রস্তর যুগ সম্বন্ধে সন্ধান পাওয়া গেছে?

৪। শূন্যস্থান পূরণ করো।

ক) প্রায় ———— বর্ষ পূর্বে পৃথিবীর জলবায়ুতে বড় পরিবর্তন ঘটেছিল।

খ) নূতন প্রস্তর যুগে পাওয়া ———— ফসল কাটার কার্যে সহায়ক হয়েছিল।

গ) নূতন প্রস্তর যুগে ————কে মানুষের প্রথম পোষা প্রাণী ভেবে পালন করা হত।

ঘ) প্রথমে ভারতের ———— অঞ্চলে নূতন প্রস্তর যুগ আরম্ভ হয়।

ঙ) নূতন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্রগুলি ———— ও———— ছিল।

চ) কাশ্মীরের —————তে নূতন প্রস্তর যুগের মানব বসতির সন্ধান পাওয়া যায়।

ছ) দুজালি হাড়িং-এ মূল্যবান জেড্ পাথর —————- থেকে এসেছিল বলে বিশ্বাস করা হয়।

জ) মেহেরগড়ের ঘরগুলি ————— অথবা ————— আকারে নির্মাণ করা হয়েছিল।

তোমার কাজ

তামা ও কাঁসাকে আমরা কী কী কাজে ব্যবহার করি অনুধ্যান করে লেখো।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতে প্রথম নগরীকরণ

সুরেখা তার বাবার ছোট্ট ঘরে একটি বই টেবিলের উপরে পড়ে থাকতে দেখল। সেই বইটি একটি পুরানো খবরের কাগজের মলাটে ছিল। সেই কাগজে একটি খবর লেখা ছিল ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা হরিয়ানার বেবুয়া গ্রাম থেকে হরপ্পা সভ্যতার লোকের ১০টি কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন। সুরেখা তার বাবাকে প্রশ্ন করল, হরপ্পা সভ্যতার অর্থ কী? তার উত্তরে বাবা যা বললেন এসো তা শুনব।

নূতন প্রস্তর যুগে কৃষিকাজ ও পশুপালনের জন্য লোকেরা ধীরে ধীরে স্থায়ীভাবে একত্রে বসবাস করতে লাগল। ফলে গ্রামীণ জীবন আরম্ভ হল। ভারত উপমহাদেশে নূতন প্রস্তর যুগের বাসস্থানগুলি প্রথমে সিন্ধুনদীর পশ্চিমদিকে আরম্ভ হল এবং পরে অন্য অঞ্চলে গড়ে উঠল। পাকিস্তানের মেহেরগড়ে নূতন প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি প্রথমে বিকাশ লাভ করেছিল বলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা। কৃষির বিকাশ ও ধাতুর ব্যবহারের ফলে কিছু বাসস্থান শহর ও নগরে পরিণত হল। বিশেষ করে কাঁসা ধাতুর ব্যবহারকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে কয়েকটি নগর গড়ে উঠল। প্রত্যেক নগরকে ঘিরে রইল বিস্তৃত কৃষিজমি, অরণ্য ও নদী। কালক্রমে সেই নগরগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে মাটির গহ্বরে লুপ্ত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা নগর সমূহের সেই ধ্বংসস্তূপগুলি খুঁড়ে মূল্যবান নিদর্শন উদ্ধার করেছেন। তাঁরা সিন্ধুনদী উপত্যকার বিভিন্ন স্থান জুড়ে দু'টি প্রাচীন শহর উদ্ধার করেছেন। এই শহর দু'টি হল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো। অধুনা এই দু'টি শহর পাকিস্তানে অবস্থিত। এই সভ্যতা প্রায় খ্রীঃপূঃ ৫০০০ বর্ষ পূর্বে আরম্ভ হয়েছিল বলে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মত প্রকাশ করেছেন।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদ দয়ারাম সাহানী মাটির ভিতর থেকে হরপ্পা শহর আবিষ্কার করেন। ইহা সিন্ধুনদীর উপনদী রাবী নদীকূলে অবস্থিত। সেই প্রকার ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুনদীকূলে অবস্থিত মহেঞ্জোদারো শহর ভূগর্ভ থেকে আবিষ্কার করেন। মহেঞ্জোদারোর অর্থ 'মৃতনগরী'। হরপ্পা থেকে মহেঞ্জোদারোর দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মাইল। কিন্তু এই দু'টি শহরের মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন পণ্ডিতগণ।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো শহর দু'টি সিন্ধুনদী উপত্যকায় অবস্থিত হওয়ার কারণে একে সিন্ধু সভ্যতা বলা হয়। হরপ্পার সন্নিকটে খননকার্য দ্বারা প্রথমে এই সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ায় একে হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়। এই হরপ্পা সভ্যতার কাল নিরূপণ নির্দিষ্টভাবে স্থির করা যায়নি। এ সম্পর্কে কয়েকজন

ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন যে, মেসোপটেমিয়া সভ্যতার পূর্বে হরপ্পা সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। কারণ হরপ্পার সিল বা মোহর মেসোপটেমিয়ার 'উর' ও 'কিশ' স্থানে দেখতে পাওয়া গেছে। এই সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ ভিতরে বিকাশ লাভ করেছিল বলে কয়েকজন প্রত্নতত্ত্ববিদ মত প্রকাশ করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ ভারতের অন্য অঞ্চল থেকেও কিছু প্রাচীন নগরসমূহের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছেন। এ সমস্ত ধ্বংসাবশেষ হরপ্পা ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে। প্রাপ্ত কিছু নিদর্শন সিন্ধু উপত্যকার জিনিস বলে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং সেগুলি যে হরপ্পা সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত পণ্ডিতগণ এই মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে পাঞ্জাবের রোপড়, গুজরাটের লোথাল এবং ধোলাধারা, রাজস্থানের কালিবনগাঁ, হরিয়ানার বনত্তালি প্রভৃতি প্রধান।

হরপ্পা সভ্যতার মুখ্যস্থানসমূহ

মহানদীকূলে অবস্থিত কয়েকটি শহরের নাম মানচিত্র দেখে তালিকা করো।

নগর পরিকল্পনা ঃ

শহরের উপরভাগের সুরক্ষিত স্থান

হরপ্পা সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নগর নির্মাণ। পরিকল্পনা অনুযায়ী নগর নির্মাণ করা হত। কাজের সুবিধার জন্য প্রত্যেক শহরকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। একটি ভাগ উপত্যকার উচ্চস্থানে নির্মিত হত। চারদিকে প্রাচীর ঘেরা থাকাতে ইহা দুর্গের মত সুরক্ষিত ছিল। এই স্থানে শাসক, রাজকর্মচারী, ধর্মযাজক ও বণিকেরা বাস করত বলে অনুমান করা হয়। এখানে সাধারণ গৃহ, ধর্ম অনুষ্ঠান ও শস্যাগার ছিল। দ্বিতীয় ভাগটি নিম্নভাগ অর্থাৎ পাদদেশে অবস্থিত ছিল। এখানে সাধারণ লোক, কৃষক, শ্রমজীবীদের বাসগৃহ ছিল।

নগর গঠন প্রণালী

শহরের পরিকল্পনা আধুনিক শহরের মত উন্নত ছিল। শহরের মাঝ বরাবর দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাস্তা ছিল। এই রাস্তার শাখা রাস্তাগুলি সমকোণে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হত। রাস্তাগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণে ও পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সোজা গিয়েছিল। মহেঞ্জোদারোর প্রধান রাস্তা ৮০০ মিটার লম্বা ও প্রস্থ ১০ মিটার ছিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে জল ও আবর্জনা নিস্কাশনের জন্য পাকা নালা ছিল। রাস্তাগুলির দরুন সমগ্র শহর বর্গক্ষেত্র ও আয়তক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল।

বাসস্থান ঃ

রাস্তার দুইদিকে বাসগৃহগুলি পরিকল্পনা অনুসারে নির্মাণ করা হত। ঘরগুলি পোড়া ইঁট দিয়ে তৈরি করা হত। এই গৃহগুলি একতলা বা দ্বিতল বিশিষ্ট ছিল। ঘরের মধ্যে আলো ও বাতাসের জন্য জানলা ও দরজার ব্যবস্থা ছিল। দোতলায় যাওয়ার জন্য কাঠের সিঁড়ি ছিল। প্রত্যেক বাসগৃহের মাঝখানে একটি করে উঠোন থাকত। উঠোনের পাশে স্নানঘর ছিল। প্রত্যেক ঘরের নোংরা জল ও আবর্জনা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘরের ভিতরে ছোট নালার ব্যবস্থা থাকত। সেই নালাকে আবার রাস্তার মুখ্য

নালার সঙ্গে সংযুক্ত করা হত। এর থেকে জানা যায় যে তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা স্বচ্ছতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে সচেতন ছিল। কাঠের তৈরি ছাদ সমতল ছিল। শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা এক কুঠরি বিশিষ্ট ছোট ঘরে থাকত।

স্নানাগার ঃ

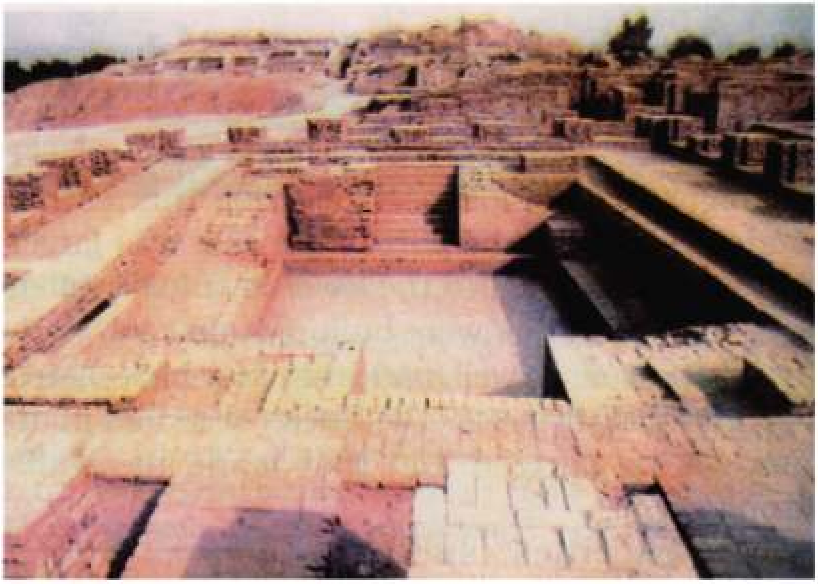

মহেঞ্জোদারোর বৃহৎ স্নানাগার

হরপ্পা সভ্যতার মূল আকর্ষণ ছিল এক বৃহৎ স্নানাগার। মহেঞ্জোদারো থেকে আবিষ্কৃত এই স্নানাগার আয়তকার বিশিষ্ট ছিল। এর লম্বা ৫৫ মিটার, প্রস্থ ৩৩ মিটার। এর দেওয়াল ও সিঁড়িগুলি পোড়া ইঁট দিয়ে তৈরি হয়েছিল। সিঁড়িগুলি জলের নিম্নভাগ পর্যন্ত লম্বা ছিল। স্নানাগারের নিম্নভাগে এক নালা মাটির তলায় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সিঁড়িগুলি বেশ চওড়া ছিল। স্নানাগারের ঊর্ধ্বভাগে কুয়ো ছিল। এই কুয়ো থেকে জল নলের সাহায্যে স্নানাগারে ভর্তি করা হত। স্নানাগারের জল নিষ্কাশন অতি সুন্দর ছিল। স্নানাগারের নিম্নভাগে একটি নালা মাটির তলা দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেই নালা দিয়ে দূষিত জল নিষ্কাশিত হত। স্নানাগারের চতুর্দিকে ছোট ছোট অনেক ঘর ছিল।

মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার ও বর্তমানে ব্যবহৃত স্নানাগারের মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখছ লেখো।

শস্যভাণ্ডার ঃ

হরপ্পার সুরক্ষিত ভাগের উত্তর দিকে একটি বিরাট শস্যভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। এর লম্বা ৬৬ মিটার ও প্রস্থ ১৬ মিটার। এর মধ্যে দু'টি প্রকোষ্ঠ ছিল। এই দুই প্রকোষ্ঠ ভিতরে যাতায়াতের রাস্তা ছিল। এই বৃহৎ শস্যভাণ্ডারের দক্ষিণ দিকে কয়েকটি গোলাকার চাতাল দেখতে পাওয়া যায়। এই চাতালগুলি শস্য মাড়াই করার কাজে ব্যবহৃত হত। মহেঞ্জোদারোর সন্নিকটে এক বিরাট শস্যভাণ্ডার দেখতে পাওয়া যায়।

তোমার ঘরের খাদ্যশস্য কোথায় ও কেমন ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়, লেখো।

সভাগৃহ ঃ

মহেঞ্জোদারো শহরে ৭০ মিটার লম্বা ও ২৩ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড গৃহের সন্ধান পাওয়া গেছে। ২৫টি স্তম্ভ বিশিষ্ট এই গৃহ পোড়া ইঁট দিয়ে তৈরি হয়েছিল। এই গৃহে ছিল পাঁচটি কুঠরি। প্রত্নতত্ত্ববিদদের বিশ্বাস, এই গৃহটি সভা কিংবা প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হত।

সামাজিক জীবন ঃ

হরপ্পা সভ্যতার লোকদের সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক জীবন বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু জীবিকা অনুযায়ী তাদের জীবন ধারণের পদ্ধতি ও মানসিক প্রবণতা অনুমান করা যায় মাত্র।

কৃষিকাজ ঃ

হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা কৃষিকে প্রধান জীবিকা রূপে গ্রহণ করেছিল। নদীকূলের উর্বর সমতলভূমি কৃষিকার্যের জন্য উপযুক্ত ছিল। তারা এক নূতন প্রকার জঙ্গল ব্যবহার করে কৃষিকাজ করত। তারা প্রধানত গম, যব ও কার্পাস চাষ করত। গম ও যব থেকে আটা প্রস্তুত করে রুটি খেত। তাছাড়া ফল, মাছ, মাংস, ডিম খেত। এদের প্রিয় খাদ্য ছিল খেজুর।

কৃষিকার্যের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়, তার তালিকা করো।

পাশাক পরিচ্ছদ ও অলংকার ঃ

হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা তুলা ও পশমের কাপড় পরত। বিশেষ করে কার্পাস চাষ করে তা থেকে সূতা বের করে কাপড় বোনা হত। এই কাপড় পুরুষ ও স্ত্রী উভয় শ্রেণীর লোকই ব্যবহার করত। পশমের কাপড়ও তৈরি করে পরত। পুরুষেরা লুঙ্গির মতো ধুতি পরত। নারী ও পুরুষ উভয়ে বিভিন্ন প্রকার অলংকার পরত। হার, অংটি, কোমরে সূতা, বাজুবন্ধ, বালা, কানের দুল, নাকে নোলক প্রভৃতি অলংকার তারা পরতে ভালোবাসত। ধনী, বণিক, ব্যবসায়ীরা সোনা, রূপা, হাড়ের তৈরি অলংকার পরত। দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা তামা, হাড়, সমুদ্রসম্ভূত রত্ন নির্মিত অলংকার ও মাটি নির্মিত অলংকার পরত। পুরুষেরা লম্বা চুল ও দাড়ি রাখত। স্ত্রীলোকেরা হাতির দাঁত ও শিং এর তৈরি চিরুনি তথা মাথার কাঁটা ব্যবহার করত।

মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া অলঙ্কার

শিল্পকলা ঃ

কাঁসা নির্মিত নৃত্যরতা নারী মূর্তি

হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা মাটি ও ধাতু শিল্পে নিপুণ ছিল। সোনা, রূপা, তামা, টিন এবং দস্তা ধাতুর বিভিন্ন প্রকার পদার্থ তৈরি করত। গৃহের বিভিন্ন উপকরণ যথা— থালা, পাত্র, কলসি, টব, ক্ষুর, ছুঁচ, কাস্তে, তরবারি, তির, বর্শা প্রভৃতি ধাতু দিয়ে নির্মাণ করত। মহেঞ্জোদারোতে এক ব্রোঞ্জ বা কাঁসা ধাতুর নৃত্যরতা নারীর মূর্তি পাওয়া গেছে।

হরপ্পা সভ্যতার প্রধান শিল্প ছিল মাটির পাত্র নির্মাণ করা। চাকার সাহায্যে অনেক সুন্দর সুন্দর মাটির পাত্র তৈরি করতে অভ্যস্ত ছিল। মাটির হাঁড়ি, কলসি, কুঁজো, থালা, বাটি প্রভৃতি বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করত। এই মাটির পাত্রগুলি তাদের নিপুণ চিত্রাঙ্কনে ভরা। সেগুলির ওপর আকর্ষণযোগ্য নানা প্রকার রঙের প্রলেপ দেওয়া হত। বাচচাদেব খেলনা কাদামাটিতে তৈরি হত। চাকা লাগানো ছোট ছোট গাড়ি, বিভিন্ন পশুপক্ষী, মানুষ, জীবজন্তুর চিত্র তৈরি করে তার উপরে রঙের প্রলেপ দেওয়া হত। গুহা-চিত্র, মূর্তি-চিত্র, প্রস্তর-চিত্র—এসব চিত্র দেখলে বেশ বুঝা যায়, শিল্প সৃষ্টির প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল।

মাটি পাত্র

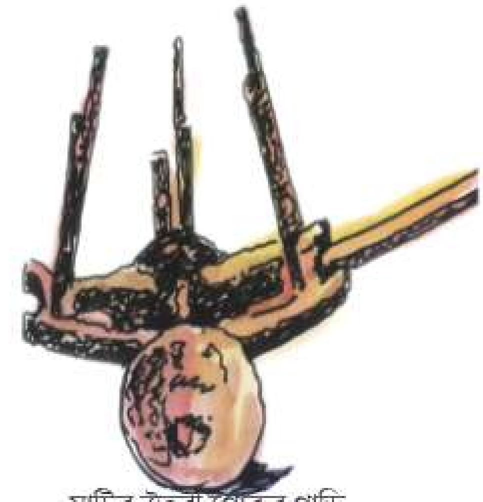

মাটির তৈরী গোরুর গাড়ি

তোমার ঘরে রাখা মাটির তৈরি জিনিসগুলির নাম লেখো।

মোহর ঃ

হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সংখ্যক পোড়া মাটির মোহর পাওয়া গেছে। এই মোহরগুলিতে লোকেদের জীবনধারণ পদ্ধতি বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়। এই মোহরগুলির উপরে বৃষভ, মহিষ, হস্তী, সর্প, কুমির, বুনোমহিষ তথা বহু নারী মূর্তি, যোগাসন মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব তাদের সচেতন মন ও নিপুণ হাতের পরিচায়ক।

চিত্র ও লিপি মুদ্রিত মোহর

মোহরের উপরে যে সব লিপি খোদিত আছে এ পর্যন্ত তা ঠিকভাবে পড়া যায়নি। এগুলি তাদের ধর্ম, বাণিজ্য, সামাজিক ব্যবস্থার পরিচায়ক—গবেষকরা তাই অনুমান করেন।

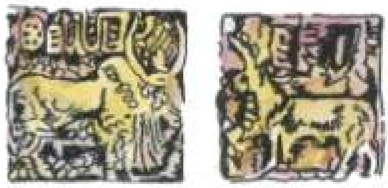

সিন্ধু প্রদেশের মোহর

বাণিজ্য ঃ

হরপ্পা সভ্যতার কয়েকটি মোহর-এ নৌকার ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি দেখলে জানা যায় যে, সে যুগের লোকেরা নৌবাণিজ্য করত। তারা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য, বিভিন্ন অলংকার, মৃৎপাত্র এসব সামগ্রী নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। গুজরাটের লোথালে পোতাশ্রয়ের অবশেষ পাওয়া গেছে। এদের বাণিজ্য-বৃত্তি ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আফগানিস্তান ও মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল পণ্ডিতগণ এরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

গুজরাটের লোথালের পোতাশ্রয়

লিপি ঃ

হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীদের ভাষা এবং লিপি বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে আমাদের কিছু জানা নেই। মোহরগুলিতে অঙ্কিত চিত্র দেখে বলা যেতে পারে যে, তারা ছবি-লিপি ব্যবহার করত। বর্তমান পর্য্যন্ত ৪০০র থেকে বেশি চিহ্ন বা ছবি অবিষ্কার করা গেছে। স্তূপ থেকে আবিষ্কৃত ছবি-লিপি থেকে অনুমান করা যায় যে এর মাধ্যমে তাদের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে মনের ভাবপ্রকাশ পেত।

দেবী মূর্তি

ধর্ম ঃ

হরপ্পা সভ্যতার কোনো মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রস্তরের মূর্তি, তামা কিংবা পোড়া মাটির মোহরের উপরে খোদিত বিভিন্ন মূর্তি দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে তারা পশুপক্ষী , দেবী, বৃষভ, সর্প, বৃক্ষ প্রভৃতির

পূজা করত। কয়েকটি মোহরের মাতৃমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা যায় যে সে সময়ে সর্প উপাসনা, বৃক্ষ উপাসনা ছাড়াও স্ত্রীদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল।

হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিল। সুতরাং তারা মৃতদেহটি উত্তর দিকে মাথা করে পাত্র, দর্পণ, চিত্রাঙ্কিত লাঠি ইত্যাদি প্রিয় জিনিসগুলি পুঁতে দিত।

পশুপতি মূর্তি

হরপ্পা সভ্যতার পতন ঃ

প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব দুই হাজার বৎসর পূর্বে হরপ্পা সভ্যতার পতন আরম্ভ হয়। এই পতনের জন্য কতকগুলি কারণ দায়ী। যথা—

- বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা হেতু এই সভ্যতার পতন ঘটে। সিন্ধু নদীতে বন্যা হওয়ার ফলে লোকেরা শহর ছেড়ে অন্য জায়গায় পালিয়ে গিয়েছিল। যে স্থানে তারা পালিয়ে গিয়েছিল সে জায়গাতে এ সভ্যতা পুনরায় আরম্ভ করে।
- কিছু ঐতিহাসিকদের ধারণা বারংবার ভূমিকম্প হওয়ার দরুন এই সভ্যতা মাটির নীচে পুঁতে গিয়েছিল।
- অনেকের মতে আর্যদের আক্রমণের ফলে এই সভ্যতা লোপ পেয়েছে। মহেঞ্জোদারোতে গণহত্যার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেখানে প্রাপ্ত কঙ্কালগুলিতে তীক্ষ্ণ তাম্র দ্বারা আঘাতের দাগ চিহ্নিত হওয়ায় গবেষকদের এই অনুমান।
- অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে মহামারি প্লেগ হরপ্পা সভ্যতার পতনের জন্য দায়ী। কারণ, শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের কঙ্কাল ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

অভ্যাস

১। নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর ৫০টি শব্দে দাও।

ক) হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন ভারতের কোন কোন স্থানে পাওয়া গেছে?

খ) হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো শহর দু'টি কবে ও কার দ্বারা মাটির নিচে থেকে আবিষ্কৃত হয়?

গ) হরপ্পা সভ্যতাকে কেন ভারতের প্রথম শহুরে সভ্যতা বলা হয়?

ঘ) মহেঞ্জোদারো শহরে আবিষ্কৃত স্নানাগারের গঠন প্রণালী কেমন ছিল?

ঙ) হরপ্পা শহরের গঠন প্রণালী সম্পর্কে লেখো।

চ) হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীদের বাসগৃহগুলির গঠনশৈলী কেমন ছিল?

ছ) মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত স্নানাগারের নির্মাণকৌশল কেমন ছিল?

জ) হরপ্পার শস্যভাণ্ডার বিষয়ে ধারণা বিবৃত করো।

ঝ) হরপ্পা সভ্যতার লোকেদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার কেমন ছিল?

ঞ) হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা মৃৎশিল্প ও ধাতুশিল্পে নিপুণ ছিল—একথা কীভাবে জানা গেল?

ট) হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা কোন কোন দেবদেবীর পূজা করত?

ঠ) হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণ কী? কারণগুলির মধ্যে কোন কারণটি তুমি অধিক দায়ী বলে মনে করো ও কেন?

ড) কোন কোন তথ্যসূত্র থেকে হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস এবং পূজা পদ্ধতি বিষয়ে জানা যায়, উল্লেখ করো।

২। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর ৩০টি শব্দের মধ্যে লেখো।

ক) মহেঞ্জোদারোতে স্নানাগারের জল প্রবেশ ও নিষ্কাশনের উপায় লেখো।

খ) হরপ্পা সভ্যতার সভাগৃহের গঠন প্রণালী কেমন ছিল?

গ) হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা কোন শিল্পকলাতে নিপুণ ছিল ও তারা কোন ধাতুর ব্যবহার জানত?

ঘ) হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা কী উপায়ে শবদেহ সংস্কার করত?

ঙ) হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা কী জিনিস খাদ্যদ্রব্যরূপে গ্রহণ করত?

৩। প্রত্যেকপ্রশ্নের উত্তর একটি বাক্যে লেখো।

ক) হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতাকে সিন্ধু সভ্যতা বলা হয় কেন?

খ) হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা কী লিপি ব্যবহার করত?

গ) মহেঞ্জোদারো'র অর্থ কী?

ঘ) হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা প্রধানত কী চাষ করত?

ঙ) হরপ্পা সভ্যতার প্রধান শিল্প কী ছিল?

৪। বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো।

ক) হরপ্পা সভ্যতার ঘরগুলি ———— এ তৈরি হয়েছিল।

(পোড়াইট, পাথর, মাটি, চুনাপাথর)

খ) হরপ্পা শহরটি বর্তমান ———— এ অবস্থিত।
(ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান)

গ) হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা ———— ধাতুর ব্যবহার জানত না।
(তামা, কাঁসা, টিন, লোহা)

ঘ) হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা ———— চাষ করত।
(ধান, বাজরা, কার্পাস, পাট)

৫। 'ক' স্তম্ভের শব্দের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের উপযুক্ত শব্দ বেছে যোগ করো।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
লোথাল	স্নানাগার
মহেঞ্জোদারো	রাধীনদী
ছবিলিপি	সমতল
হরপ্পা	পোতাশ্রয়
ঘরের ছাদ	মোহর
	ভারত

৬। রেখাঙ্কিত পদগুলি পালটে ভ্রম সংশোধন করো।

ক) হরপ্পা সভ্যতার লোকদের প্রধান খাদ্য ভাত ছিল।

খ) শস্যখাদ্যগুলি সাধারণত শস্য মাড়াই করার জন্য থাকত।

গ) হরপ্পায় ঘরের দোতলা যাওয়ার জন্য পাথরের তৈরি সিঁড়ি ব্যবহার করা হত।

ঘ) হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা ব্যবসাবাণিজ্যকে প্রধান জীবিকারূপে গ্রহণ করেছিল।

তোমার জন্য কাজ

তোমার ঘরে খাদ্যশস্য কোথায় ও কেমন করে গুছিয়ে রাখা হয় ভেবে লেখো।

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন জীবনধারণ প্রণালী

গরমের ছুটিতে মানস কটকে তার মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। তার মামা তাকে সেখানের এক লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়েছিল। সেই লাইব্রেরীর এক কুঠরীতে অনেক পুরনো বই মানস দেখতে পেল। তার মধ্যে বেদের চারখানা বইও সে দেখতে পেল। বেদ কী জানার জন্য সে মামাকে জিজ্ঞাসা করল। উত্তর দিতে গিয়ে মামা যা বলল, তা শোনো।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষের সবচেয়ে পুরানো গ্রন্থ হলো বেদ। বেদ শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। সর্বমোট চারখানি বেদ আছে। সেগুলি হল ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ। এদের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রথমে রচিত হয় পাঞ্জাব অঞ্চলে। অন্য বেদগুলি পরে গঙ্গানদী উপত্যকা অঞ্চলে রচিত হয়। বেদ হল আর্যদের গ্রন্থ। এর মন্ত্রগুলি মুনিঋষিরা সংস্কৃত ভাষায় মুখে মুখে রচনা করেছিলেন। অনেক দিন পরে, যখন মানুষ লিখতে শিখল, তখন বেদগুলি লিখিত আকারে পাওয়া গেল। প্রথমে বেদের মন্ত্রগুলি লোকেরা শুনে শুনে মনে রাখত; তাই বেদের অন্য নাম হচ্ছে 'শ্রুতি'।

প্রায় খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অর্থাৎ প্রায় ৩৫০০ বর্ষ পূর্বে ঋগ্বেদ রচনা করা হয় বলে বিশ্বাস। গ্রন্থটি দশটি ভাগ বা মণ্ডলে বিভক্ত। এতে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা রয়েছে। ঋগ্বেদের সঙ্গে ইরানের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ 'আভ্বাস্তা'র অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে। 'সাম' শব্দের অর্থ গান। সামবেদে অনেক সংগীতময় প্রার্থনা থাকলেও যজুর্বেদে কিন্তু ধর্ম ও পূজা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। অর্থববেদে ভূতপ্রেত দূর করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্র রয়েছে।

ঋগ্বেদের সময় হচ্ছে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ থেকে ১০০০ সাল এবং অন্য বেদগুলি খ্রীঃ পূঃ ১০০০ থেকে ৬০০ সালের মধ্যে রচনা করা হয়েছিল। প্রথমটি ঋগ্বেদীয় যুগ এবং দ্বিতীয় সময়কে পরবর্তী বা উত্তর বৈদিক যুগ বলা হয়।

বেদ সদৃশ আর কয়েকটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের নাম সংগ্রহ করে একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

উপনিষদ হচ্ছে বেদের একটি অংশ। এতে আত্মা, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম, মোক্ষ ইত্যাদি বিষয়ে লেখা রয়েছে। বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা আর্যজাতির সামাজিক জীবন, অর্থনীতি, ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থা বিষয়ে জানতে পারি।

বৈদিক সাহিত্য ছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য থেকে সে যুগের সভ্যতার বিষয়ে জানা গেছে। হস্তিনাপুর, অত্রঞ্জিখেরা, নোহ প্রভৃতি স্থান থেকে পাওয়া মৃৎপাত্রের পরবর্তী যুগের সংস্কৃতির বিষয়ে জানতে পারি। সেই পাত্রগুলি ধূসর রঙের চিত্রিত মাটির পাত্র এবং লাল ও কালো রঙের মাটির পাত্র।

ভারতের মানচিত্র এঁকে সেখানে বৈদিক সভ্যতা গড়ে উঠা অঞ্চলগুলি দেখাও।

শাসনব্যবস্থা ঃ

আর্যরা বহুসংখ্যক গাইগোরু, ঘোড়া প্রভৃতি পশু নিয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। প্রথমে যাযাবর জীবনযাপন করার পরে কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করল। 'জন' ও 'বিশ্' এই দুটি শব্দ ঋগ্বেদে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। দলের সকল লোককে জনরূপে বোঝানো হত এবং বিশ্ বলতে দলের কিছু সংগঠনকে বোঝানো হত। দলের সবচেয়ে শক্তিশালী বিবেচিত ব্যক্তিকে 'রাজা' বলে লোকে স্বীকার করত। কতকগুলি পরিবার বা বংশ নিয়ে গ্রামের সৃষ্টি হয়েছিল। পরিবার ও গ্রামের মোড়লদের যথাক্রমে 'কুলপ' ও 'ব্রজপতি' বা 'গ্রামণী' বলা হত। রাজতন্ত্র প্রধান শাসনব্যবস্থা ছিল ও রাজা খুব শক্তিশালী ছিলেন।

বর্তমানের গ্রামাঞ্চল শাসনব্যবস্থা-সহ উপরে বর্ণিত ব্যবস্থার কি সামঞ্জস্য বা পার্থক্য রয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা কর।

গ্রাম্য জীবন ঃ

ভারতে আগমনের পর আর্যরা বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করতে শুরু করল। কতকগুলি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম গঠিত হত। পরিবারের সকলেই একসাথে থাকত। কৃষি তাদের প্রধান জীবিকা ছিল। তারা পশুপালনও করত। গাইকে সম্পত্তি রূপে বিবেচনা করা হত। পরিবারে পিতা ছিলেন প্রধান। তাঁকে কুলপতি বলা হত। সমাজে নারীর প্রাধান্য ছিল। নারীরা পুরুষদের সঙ্গে বিভিন্ন কার্য, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি সব কাজেই নির্বিরোধে যোগ দিত। ঘোষা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি নারীরা বৈদিক মন্ত্র রচনা ও আবৃত্তি করতেন।

বৈদিক যুগের আরম্ভ কালে ঘোড়াদের আগমন ঘটনা সেসময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঘোড়া চালিত রথ যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হত।

আর্যদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। শাসক শ্রেণীতে রাজা, তাঁর কর্মচারী, যোদ্ধা অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল পুরোহিত এবং তৃতীয় শ্রেণীতে থাকত সাধারণ লোক। ঋগ্বেদ সময়ের শেষের দিকে সমাজকে চারি বর্ণে বিভক্ত করা হল। সেগুলি হল—ব্রাহ্মণ (ধর্মকার্যের জন্য)

ক্ষত্রিয় (শাসন ও যুদ্ধ কাজের জন্য) বৈশ্য (চাষ ও বিভিন্ন পদার্থ উৎপাদনের জন্য) এবং শূদ্র (অন্য তিন বর্ণের সেবার জন্য)।

লোকেরা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য বেশি পরিমাণে খেত। এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজী, ডাল জাতীয় পদার্থ ও মাংস ইত্যাদি ছিল প্রতিদিনের খাদ্যসামগ্রী। গম ও যব প্রধান খাদ্য ছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে ধান যব উৎপাদন করতে শিখল। পশু অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় পৌছলো। ঋগ্বেদে পানীয় রূপে সোমরস ও সুরার উল্লেখ রয়েছে।

প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে আর্যরা পূজা করত। প্রকৃতির দৃশ্যাবলীর অন্তরালে যে দেবতাদের সত্তা আছে, এ প্রকার বিশ্বাস ও ধারণা তাদের ছিল। তারা উষা, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা করত। পৃথিবীকে মাতৃদেবী রূপে পূজা করত। দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজনের রীতি ছিল। সেজন্য ঘি, দুধ ইত্যাদি দ্রব্য অগ্নিতে অর্পণ করা হত।

সমসাময়িক তাম্র প্রস্তর যুগের মানব বসতি

ইনামগাঁও ঃ

মহারাষ্ট্র প্রদেশের ভীমানদীর শাখানদী খোদের নিকটে ইনামগাঁও অবস্থিত। যখন উত্তর পশ্চিম দিকে পাঞ্জাব অঞ্চল এবং গঙ্গানদীর অববাহিকাতে আর্যরা সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই সময় ইনামগাওতে তাম্র প্রস্তর যুগের সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদরা বিশ্বাস করেন যে সেই সভ্যতা প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৬০০ অর্থাৎ ৯০০ বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন দিকে বিকাশ লাভ করে গড়ে উঠেছিল। সেখানে খননকার্যের পরে প্রায় ১৩৪টি মাটির চৌকোনা ঘর আবিষ্কার করা গেছে। সাধারণত ঘরের একটি বা দু'টি কুঠরী ছিল। পাঁচটি কুঠরী যুক্ত ঘরে সেকালের শাসক বাস করতেন বলে অনুমান করা হয়। হরপ্পার মত সেখানেও শস্য, রাখার ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়।

ডিম্বাকৃতি বা দীর্ঘবৃত্তাকার গর্তকে উনুনের মত ব্যবহার করা হত। ঘরের ভিতরে ও বাইরে এই প্রকার উনুন দেখতে পাওয়া যায়। লোকেরা গর্ত খুঁড়ে মাটির ভিতরে শস্য রাখত। কয়েকটি গর্তে তারা নোংরা আবর্জনা ফেলত। লাল এবং কালো রঙের মৃৎপাত্র তারা ব্যবহার করত। প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রের সাহায্যে গাছকাটা, পশুদের মাংস টুকরো টুকরো করা ও তাদের গা থেকে চামড়া ছুলে বের করা ইত্যাদি বিবিধ কার্য নিষ্পন্ন হত। লোকেরা তামার তৈরি হাতহাতিয়ার ব্যবহার করত। ইনামগাঁও-এর অধিবাসীরা রাজস্থান থেকে তামা আনত। সেখান

লোথালে পাওয়া মাটিঘোড়া

থেকে কোঁড়, চিমটা, বঁড়শী-কাঁটা, ধারালো তীর ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া গেছে। মালা, চুড়ি, তোড়া প্রভৃতি অলঙ্কার পাওয়া গেছে। এগুলো তামার তৈরি। বাদামী লাল রঙের মৃৎপাত্র, হাতির দাঁত, শামুকের মাল্যাদি এখান থেকে পাওয়া গেছে। মাটির মূর্তিও পাওয়া গেছে। পোড়া ইঁটে তৈরি পশুদের ছোট ছোট মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলো খেলনা অথবা ধর্মের কাজে ব্যবহৃত হত বলে ধারণা করা যায়। বৃষভ চিত্রাঙ্কিত মাটির পাত্রেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

আজকাল কৃষকরা শস্য মাড়াই করবার জন্য জমি থেকে এনে কিভাবে গুছিয়ে রাখে, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

সমাধি স্থান ঃ

ইনামগাঁওয়ে কিছু সমাধির সন্ধান পাওয়া গেছে। অধিকাংশ সমাধিতে মৃত পুরুষ লোকের অস্থি পাওয়া গেছে। মৃতদেহের মাথা উত্তর দিকে রাখা হয়েছিল। ঘরের ভিতরও সমাধি দেওয়া হত। খাদ্য ও জলপাত্র মৃতব্যক্তির নিকটে রাখা হত। লোকেরা মাতৃ উপাসনা করত বলে অনুমান করা যেতে পারে।

অধিবাসীরা যে আহারের জন্য গম, যব, মুসুর, মটর, ভুট্টা, বাজরা, শিম ইত্যাদি শস্যের চাষবাস করত, এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া গেছে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, ঘোড়া, গাধা, শূকর, হরিণ, কাঠবিড়াল প্রভৃতি জীবজন্তুদের অস্থি সেখান থেকে পাওয়া গেছে। কুমীর, কচ্ছপ, কাঁকড়া ও মাছ প্রভৃতির অস্থির সন্ধান পাওয়া গেছে। মাছ, মাংস, গাইদুধ, জাম, খেঁজুর ও বিভিন্ন প্রকার কুল তারা খেত। ইনামগাঁওয়ে উন্নত ধরনের কৃষিকার্যের পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রায় ৯০০ বৎসর পর্যন্ত কাল বিকশিত হওয়ার পরে এই সভ্যতার ধ্বংস আরম্ভ হয়। কম বৃষ্টিপাত অথবা জমির উর্বরতা হ্রাস পাওয়ার ফলে কৃষিকার্যের উপযোগী জমি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বলে অনুমান করা হয়। ফলে কৃষিকার্য ছেড়ে সেখানের লোকজন একস্থানে না থেকে পশু শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ করতে লাগল। ঘরের আকৃতি খুব ছোট ছোট হয়ে গেল।

প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০-২১০০ সালের মধ্যে ব্যাবিলন ও নিকটবর্তী স্থানগুলিতে হিটাইট নামক লোকেরা লোহা পাথর থেকে লোহা বের করবার কৌশল শিখল। লোহা পাথরকে গলিয়ে তা থেকে লোহা বের করতে লাগল। কালক্রমে এই কৌশল পারস্যের লোকেরাও শিখল যে আর্যদল পারস্য থেকে হিন্দুকুশ অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেছিল, তারা বোধহয় লোহার ব্যবহার জানত। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ সালের সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে গান্ধার অঞ্চলে লোহার ব্যবহার যে হত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পরবর্তী বৈদিক যুগে লোহার ব্যবহার গঙ্গানদীর অববাহিকা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল। সেই অঞ্চলে জঙ্গল পরিষ্কারের কাজের হয়ত লোহার কুড়াল ব্যবহার করত। কারণ পরবর্তী বেদে শ্যাম বা কৃষ্ণ আয়স (লোহা)-র উল্লেখ রয়েছে।

লৌহযুগ ও পরবর্তী বা উত্তর বৈদিক যুগের আরম্ভ প্রায় এক সময়ে হয়েছিল বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। উত্তর ভারতের কয়েকটি স্থানে যথা হস্তিনাপুর, ভগবানপুরা, অত্‌রঞ্জিখেরা থেকে এক প্রকার

ছাই রঙের চিত্রিত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা একে চিত্রিত ধূসর পাত্র বলেন। এতে লোহার অংশ মিশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা বোঝা যায়। এই প্রকার পাত্র বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। এছাড়া লাল এবং কালো রঙের মৃৎপাত্রের ব্যবহারের জন্য ভারতে দু'টি পরিবর্তন সংঘটিত হল। লোহার অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আর্যরা কৃষ্ণকায় মূল ভারতীয়দের সহজে পরাজিত করতে পারল এবং কুড়াল দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে বেশি পরিমাণে জমি চাষ করতে পারল। ফলে শস্য উৎপাদন বেশি হল।

আর্যদের প্রকৃত বাসস্থান ও তাদের প্রকৃত পরিচয় আজও পর্যন্ত রহস্যে ঘেরা। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, তারা প্রথমে এশিয়া মহাদেশের কেন্দ্রাঞ্চলে বসবাস করত। কালক্রমে তাদের মধ্যে একটি দল উত্তর দিকে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করল এবং অন্য আর একটি দল পারস্য বা বর্তমানের ইরানে প্রবেশ করল। পারস্য থেকে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে উত্তর পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করল। যারা ভারতে প্রবেশ করল, তাদের ভারতীয় আর্য বলে বলা হল। তারা ভারতীয় আর্য বলেই পরিচিত হল। যে ভাষায় তারা ভাবের আদানপ্রদান করত, তাকে সংস্কৃত ভাষা বলা হল। সেই ভাষা আজকের সংস্কৃত ভাষা থেকে বহুপরিমাণে আলাদা। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আর্যরা সিন্ধু, বিতস্তা (ঝিলিম) চন্দ্রভাগা (চেনাব), ইরাবতী (রাবী), বিপাশা (বেতাস) ও শতদ্রু (শতলেজ) ইত্যাদি নদীর নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে লাগল। এই নদীগুলিকে তারা 'সপ্তসিন্ধু' বলত। এই অঞ্চল 'ব্রহ্মাবর্ত' নামে অভিহিত হল।

জনপদ ও মহাজনপদ ঃ

ঋগ্বেদীয় যুগের জনজাতি রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরবর্তী বৈদিক যুগে ক্ষেত্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিণত হল। রাষ্ট্রগুলি এক ভৌগোলিক সীমাতে আবদ্ধ রইল। এর নাম হল জনপদ। জনপদগুলি সেখানের শ্রেষ্ঠ জাতির নাম অনুসারে নাম রাখা হয়েছিল। ঋগ্বেদীয় যুগে রাষ্ট্রের প্রধানকে রাজন বলা হত। এই পদ বংশানুক্রমিক ছিল। তার ক্ষমতা ছিল সীমিত। সভা সমিতি, বিধাতা ও গণ প্রভৃতি জনজাতি পরিষদের জন্য রাজনের ক্ষমতা সীমিত ছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে সেই পরিষদগুলির গুরুত্ব কমে যাওয়ায় রাজনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর সময় জনপদগুলি নিজের সীমা বাড়াতে প্রয়াস শুরু করল। সীমা বৃদ্ধি প্রাপ্ত জনপদকে মহাজনপদ বলা হল। বৌদ্ধ গ্রন্থে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ শতাব্দীর সময় উত্তর ভারতের ১৬টি মহাজনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কোশল, মগধ, বৎস ও অবন্তী অধিক শক্তিশালী ছিল। এ ছাড়া সে সময় কিছু জনরাজ্যও ছিল। পরবর্তীকালে রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর অধীনস্থ মগধ অন্য মহাজনপদগুলি অধিকার করে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হল।

আমাদের দেশের রাজ্য এবং তাদের রাজধানীর নাম লেখো।

প্রত্যেক মহাজনপদের রাজধানীর সঙ্গে কিছু প্রসিদ্ধ স্থান বা শহর ছিল। কিছু মহাজনপদ রাজ্যে

দুর্গ স্থাপিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীও গঠিত হয়েছিল। নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ প্রভূত আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত।

অভ্যাস

১. **একটি অথবা দু'টি বাক্যে উত্তর দাও।**

ক) বেদের অন্য নাম কী?

খ) চারটি বেদের নাম লেখো।

গ) কোন বেদে ভূতপ্রেত দুর করার জন্য মন্ত্র রয়েছে?

ঘ) 'জন' ও 'বিশ্'-এর অর্থ কী?

ঙ) যজ্ঞানুষ্ঠানে কোন পদার্থ ব্যবহার করা হত?

চ) ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি কোন অঞ্চলে রচিত হয়েছিল?

ছ) পরবর্তী বৈদিক যুগের সময় লেখো।

জ) ইনামগাঁও সন্নিকটে কোন সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়?

ঝ) কৃষ্ণ আয়সের অর্থ কী?

২. **সংক্ষেপে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দাও।**

ক) চারটি বেদে কী লেখা আছে লেখো।

খ) ঋগ্বেদীয় সভ্যতার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে লেখো।

গ) বৈদিক যুগে নারীদের স্থান নিরূপণ কর।

ঘ) বৈদিক সভ্যতার ধর্ম বিষয়ে লেখো।

ঙ) ইনামগাঁওয়ে আবিষ্কৃত মাটির তৈরি মূর্তি সম্বন্ধে লেখো।

চ) ইনামগাঁও থেকে কোন কোন প্রাণীর অস্থি পাওয়া গেছে?

ছ) লৌহযুগ সম্বন্ধে এক বিবরণী প্রদান কর।

৩। ‘ক’ স্তম্ভের শব্দগুলির সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভের সম্পর্কিত শব্দের সঙ্গে লাইন টেনে যুক্ত কর।

‘ক’ স্তম্ভ	‘খ’ স্তম্ভ
বেদ	পরিষদ
সভাসমিতি	রাষ্ট্রের প্রধান
ব্রজপতি	মহাজনপদ
রাজন	মগধ
কোশল	গ্রামের প্রধান
বিম্বিসার	শ্রুতি
	পরিবারের মুখ্য

তোমার জন্য কাজ ঃ

আমাদের দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট নারীদের ফটো সংগ্রহ করে তাদের খ্যাতির বিষয়ে লেখো।

নূতন চিন্তাধারায় অভ্যুদয়

সুরেশ বিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে দেখল, তার প্রতিবেশী বুলুকাকার ঘরের সামনে একদল লোক ভিড় করেছে। ঘরের ভিতর থেকে কান্না শোনা যাচ্ছে। সে ঘটনাটা জানতে চাইল। জানল, বুলুকাকার মা মারা গেছে। লোকেরা তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভিড় করেছে। সুরেশ ভাবতে লাগল মরার পরে মানুষ কোথায় যায়? মরে যাওয়ার পরে তাদের অবস্থা কেমন হয়? এখন আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করবো।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমরা উপনিষদ গ্রন্থ থেকে জানতে পারবো। এতে ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তথ্যসমূহ আলোচিত হয়েছে।

মানুষ যখন নিরাশ হয়ে পড়ে তখন সে ঈশ্বরের চিন্তা করে। ঈশ্বরের নিকটে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে চেষ্টা করে। ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্ব লাভ করার জন্য ব্যাকুল হয়। মনে আধ্যাত্মিক ভাবনা জাগ্রত হয়। এই ভাবনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে উপনিষদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একজন আদর্শ শিষ্য নিজের শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, দৃঢ় মনোবল ও সেবা গুনে অসাধ্য সাধন করতে পারে। যেমন শ্রীমদ্ভগবদগীতা গ্রন্থে অর্জুন নিজের গুরু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। ব্রহ্মাকে বলা হয় পরমাত্মা বা পরমেশ্বর। এই ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে উপনিষদে সবিশেষ আলোচনা করা হয়েছে।

মহাভারত যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে কোন ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো

তেমনি অন্য আর একটি উদাহরণ রয়েছে কঠোপনিষদের নচিকেতা উপাখ্যানে। নচিকেতা কিভাবে নিজের শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও সেবা গুণে ধর্মরাজ যমের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন তা এতে বর্ণিত হয়েছে।

বই পড়ে নচিকেতা উপাখ্যান বিষয়ে জানতে চেষ্টা কর।

উপনিষদ হলো বেদের একটি অংশ। এখানে বহু জটিল তত্ত্ব যথা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে উপনিষদ রচিত হয়েছে।

উপনিষদের বিষয়বস্তু ঃ

গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন মাধ্যমে ব্রহ্মতত্ত্বের গূঢ় রহস্য উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। তবে বর্তমান উপনিষদের সংখ্যা ২০০ বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে ১৬টি উপনিষদ প্রধান। প্রত্যেক উপনিষদে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তু রয়েছে।

ভারতীয় দার্শনিকগণ উপনিষদকে বিভিন্ন ধারায় ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদমূলক ব্যাখ্যার সর্বাধিক সম্মান দিয়েছেন। শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাই সংসারের সঙ্গে অধিক সম্পৃক্ত। বল্লভাচার্য, রামানুজ প্রভৃতি ভারতীয় দার্শনিক উপনিষদকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

কয়েকটি উপনিষদের নাম সংগ্রহ করে একটি তালিকা কর।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম

মহাবীর ও জৈনধর্ম ঃ

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একবার শিক্ষকদের সঙ্গে ভুবনেশ্বর বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে তারা উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে জৈনগুম্ফা এবং ধৌলিস্তূপ ঘুরে দেখলো। ছাত্রছাত্রীরা জানতে চাইল, জৈনগুম্ফা ও বৌদ্ধস্তূপ কী ? ইতিহাস শিক্ষক তার উত্তরে যা বললেন, এসো তা জানব।

আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বর্ষ পূর্বে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে দু'জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা নূতন চিন্তাধারা নিয়ে দুটি ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তাঁরা হলেন মহাবীর জৈন ও গৌতম বুদ্ধ।

উদয়াগিরি ও খণ্ডগিরি পাহাড়ের জৈন গুম্ফাগুলির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে লেখো।

মহাবীর জৈনধর্মের প্রচারক ছিলেন। জৈনধর্মের পরম্পরা অনুযায়ী তাঁর পূর্বে দু'জন তীর্থঙ্কর তাঁদের বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঋষভনাথ হলেন প্রথম তীর্থঙ্কর এবং মহাবীর ২৪তম

তীর্থঙ্কর। মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ কাশী রাজা অশ্বসেনের পুত্র ছিলেন। মহাবীরের ২৫০ বর্ষ পূর্বে তাঁর আবির্ভাব হয়। তিনি জৈনধর্মের চারটি নীতি প্রচার করেছিলেন। সেগুলি হলো—জীবের প্রতি হিংসা আচরণ না করা, মিথ্যা না বলা, চুরি না করা ও সম্পত্তির প্রতি অনাগ্রহ তাই পার্শ্বনাথের প্রচারিত ধর্মকে ''চতুর্যাম ধর্ম'' বলা হত। মহাবীর তার সঙ্গে আর এক নীতি ''ব্রহ্মচর্য'' যোগ করার ফলে ইহা ''পঞ্চযাম ধর্ম'' নামে পরিচিত হল। এই পাঁচটি নীতিকে জৈনরা পঞ্চমহাব্রত ভাবে পালন করে আসছেন।

মহাবীর ছিলেন পার্শ্বনাথের প্রচারিত ধর্মের সংস্কারক ও প্রচারক। তিনি বৈশালী নগরের কুন্দগ্রামের এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যকালে নাম ছিল বর্ধমান। তাঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ ও মাতার নাম ত্রিশলা। তিনি যশোদা নাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করেছিল। ৩০ বৎসর পর্যন্ত গার্হস্থ্য জীবন যাপন করার পর তিনি সত্যের সন্ধানে সংসার ত্যাগ করে দীর্ঘ ১২ বৎসর কঠোর সাধনা করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ অর্থাৎ জীবনের ৪২ বৎসর বয়সে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। তিনি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী তাই তিনি 'জিন' নামে পরিচিত হন। এই 'জিন' শব্দ থেকে তাঁর প্রচারিত ধর্ম 'জৈন ধর্ম' নামে খ্যাত। তিনি ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করতে পেরেছিলেন বলে তাঁকে মহাবীর বলা হয়।

মহাবীর জৈন

ধর্মপ্রচার ঃ

মহাবীর বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে জৈনধর্ম প্রচার করেছিলেন। তিনি মগধের রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রুকে জৈন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে মগধ, অবন্তী, বৈশালী, মিথিলা ও শ্রাবস্তী ইত্যাদি স্থানে নিজের ধর্ম প্রচার করে ৭২ বৎসর বয়সে পাবা নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন।

ধর্মনীতি ঃ

সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন প্রণালীর উপরে মহাবীরের ছিল গভীর বিশ্বাস। তিনি ঈশ্বরের স্থিতি, যাগযজ্ঞ, ধর্মবিধি, পশুবলী ও জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর বাণী ছিল, প্রত্যেক জীবের প্রতি শ্রদ্ধা ও দয়া প্রদর্শন করাই মানুষের ধর্ম। অহিংসা জৈন ধর্মের মূল মন্ত্র। জৈন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা অহিংসাকে অতি কঠোর ভাবে পালন করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা রাত্রে প্রদীপ না জালানো, মুখ এবং নাক কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা, আস্তে আস্তে চলা ইত্যাদি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন কারণ এর দ্বারা কীটপতঙ্গ ইত্যাদির জীবন নাশ হয় না।

মহাবীর পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন, পুনর্জন্ম থেকে শক্তি লাভের জন্য তিনি তিনটি পন্থা অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন, যথা—সৎবিশ্বাস, সৎজ্ঞান ও সৎকর্ম। একে জৈন 'ত্রিরত্ন' বলা হয়।

মহাবীর কর্মবাদের উপরে বেশী গুরুত্ব দিতেন। প্রত্যেকের সৎকর্ম ও অসৎকর্মের উপরে তার পুনর্জন্ম নির্ভর করে। সৎকর্ম করলে পুনর্জন্ম হয় না। আত্মসংযম, শুদ্ধপূত আচরণ ও নীতিপূর্ণ জীবন যাপন দ্বারা আত্মা মুক্তি লাভ করে। আত্মার কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি হলো নির্বাণ। জৈন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান লক্ষ্য হল নির্বাণ। তা কেবল উপবাস, ধ্যান ও কঠোর সংযম দ্বারা সম্ভব হতে পারে।

জৈনরা অহিংসা নীতি কিভাবে পালন করেন, চিন্তা করে লেখো।

ধর্ম প্রসার ঃ

মহাবীরের জৈনধর্ম কালক্রমে লোকপ্রিয় হল। ইহা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল। এই ধর্মের নীতিগুলি পালি ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হওয়ায় লোকেরা সহজে জানতে পারল। জৈন ধর্মের প্রচারকেরা, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে এই ধর্মের প্রচার করতেন। এই ধর্ম কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমিত হয়ে রইল। মগধের সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং কলিঙ্গের রাজা খারবেল, জৈন ধর্ম গ্রহণ করে এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। বর্তমান গুজরাট ও রাজস্থান রাজ্যে জৈন ধর্মাবলম্বীদের অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

জৈন ধর্মের কীর্তি ঃ

ভারতের বিভিন্ন স্থানে জৈন কীর্তিস্তম্ভ নির্মিত হয়। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হল কর্ণাটকের শ্রাবণবেলগোলার জৈন কীর্তি, মহারাষ্ট্রের এলোরা পাহাড়ের জৈন গুম্ফা এবং রাজস্থানের আবু পর্বতের জৈন মন্দির। ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অবস্থিত উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাহাড়ে জৈনমন্দির, রাণীগুম্ফা ও হাতি গুম্ফা উল্লেখযোগ্য।

জৈন ধর্মাবলম্বীদের জীবন যাপন পদ্ধতি আলোচনা করে লেখো।

মহাবীরের পরে জৈন ধর্মাবলম্বীরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামক দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। যে জৈন সন্ন্যাসীরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করল তারা শ্বেতাম্বর ও যারা কোনো বস্ত্র গ্রহণ করল না নিরাভরণ রইল তারা দিগম্বর নামে পরিচিত হল।

গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম ঃ

নেপালের হিমালয় পাদদেশে কপিলাবস্তু নগর অবস্থিত । শাক্য বংশের শুদ্ধোদন ছিলেন এ রাজ্যের ক্ষত্রিয় নৃপতি তার রাণী মায়াদেবী লুম্বিনী উদ্যানে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাত দিন পরে গর্ভধারিণী জননী মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। সেই সাতদিনের শিশু পুত্রকে তার মাসী

গৌতমী মানুষ করেন। গৌতমীর কাছে পালিত হওয়ার জন্য সেই শিশুপুত্রের নাম হয় গৌতম। গৌতমের অন্য নাম সিদ্ধার্থ। বোধি বা পরমজ্ঞান লাভ করায় সিদ্ধার্থ হলেন বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন মহাবীরের সমসাময়িক।

গৌতমের নগর পরিক্রমা সময়ের এক দৃশ্য

এক সম্ভ্রান্ত রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেও রাজপ্রাসাদের বিলাস ব্যসনে তাঁর মন নেই। সংসার প্রতি, রাজকীয় পরিবেশ প্রতি তিনি উদাসীন—অন্যমনা। পুত্রের অনাগ্রহ দেখে পিতা শুদ্ধোদন সংসারের আবদ্ধ করে রাখার ইচ্ছায় যশোধারা নাম্নী এক সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। বিয়ের পরে তাঁর এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয় নাম তার রাহুল। কিন্তু সন্তান, বিবাহ ও রাজ্যসুখ গৌতমকে সংসারে বেঁধে রাখতে পারল না। গৌতম নগর পরিক্রমার সময়ে এক বৃদ্ধ এক রুগী ও এক মৃতদেহ দেখতে পেলেন। এ সব দৃশ্য দেখে তাঁর মনে বৈরাগ্য ভাব দেখা দিল। তিনি ভাবলেন সংসারে থাকলে এই প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হবে, দুঃখকষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ সন্ধান করতে হবে।

গৌতমের নগর পরিক্রমা সময়ের এক দৃশ্য

এরপরে একদিন গৈরিক বসন পরিহিত এক সন্ন্যাসীকে দেখে তিনি উপলব্ধি করলেন যে সাংসারিক দুঃখ ও কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি উপলব্ধি করলেন সন্ন্যাসের পথেই শান্তি পাওয়া সম্ভব। তাই উনত্রিশ বৎসর বয়সে এক গভীর রাত্রে স্ত্রী, পুত্র ও রাজপ্রাসাদ ছেড়ে সত্যের সন্ধানে গৃহত্যাগ করলেন। এই সংসার ত্যাগকে 'মহাভিনিষ্ক্রমণ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে।

গৃহত্যাগের পরে গৌতম ছ বৎসর ধরে বিভিন্ন স্থান ঘুরে জ্ঞান আহরণ করবার মার্গ সন্ধান করতে লাগলেন, সত্যসন্ধানী গৌতম প্রথমে আড়ার কালাম এবং পরে রুদ্রক (উদ্দক) রামপুত্তের শিষ্য হলেন। কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। অবশেষে গয়ার নিরঞ্জনা নদীতীরে এক অশ্বত্থবৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন হলেন। কঠোর তপস্যার পরে পরমজ্ঞান প্রাপ্তি হন তাঁর। জগতে পরিচিত হলেন 'বুদ্ধ' নামে। যে অশ্বত্থবৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন সেই বৃক্ষকে 'বোধিবৃক্ষ' ও সে স্থানের নাম হল 'বুদ্ধগয়া'। ইহা বর্তমান বিহারে বোধগয়া নামে পরিচিত।

বুদ্ধদেব

ধর্মপ্রচার ঃ

পরমজ্ঞান লাভ করার পরে বুদ্ধদেব প্রথমে সারনাথের হরিণ উদ্যানে পাঁচজনকে তাঁর ধর্মবাণী প্রচার করেছিলেন। এই প্রথম ধর্ম প্রচারকে বৌদ্ধধর্মে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' বলা হয়।

বুদ্ধদেব তাঁর বিদ্যজ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেছিলেন। মগধে গিয়ে রাজা বিম্বিসার ও আজাতশত্রুকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। কোশল যাত্রা করে প্রসেনজিত ও রাণী মল্লিকাকে তার শিষ্য করেন। কপিলাবস্তু গিয়ে পিতা শুদ্ধোদন, পুত্র রাহুলকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দান করেন। কালক্রমে শ্রাবস্তী, নালন্দা, কৌশাম্বী, চম্পা, পাবা, কুশীনগর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে তাঁর সধর্মের মূল কথা সহজ সরল ভাষায় প্রচার করলেন। ৪৫ বৎসর বুদ্ধদেব তাঁর ধর্ম বিভিন্ন স্থানে প্রচার করে ৮০ বৎসর বয়সে উত্তরপ্রদেশের কুশীনগর স্থানে দেহত্যাগ করেন।

বৌদ্ধকীর্তি সংবলিত ওড়িশার কয়েকটি স্থানের নাম সংগ্রহ করে একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

বৌদ্ধধর্মের

বুদ্ধদেব চারটি সত্য প্রচার করেন। একে ''চতুঃ আর্য সত্য'' বলা হয়। এগুলি হল—মনুষ্য জীবন দুঃখপূর্ণ। এই দুঃখের কারণ হল কামনা। কামনার বিনাশে দুঃখের বিনাশ অষ্টাঙ্গিক সত্যমার্গ মাধ্যমে কামনার বিনাশ হয়। কামনার বিনাশ হলে নির্বাণ প্রাপ্তি হয়।

সেই ''আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ'' হল—(১) সত্য দৃষ্টি (২) সৎ-চিন্তা বা সৎ স্মৃতি (৩) সৎ-কর্ম, (৪) সত্য-বাক্য (৫) সত্য আচার, (৬) সৎ-উদ্যোগ (৭) সৎ-জীবিকা, (৮) সত্য-সঙ্কল্প। ভোগবিলাসের পথ নয়, জৈনধর্মের কৃচ্ছ্র সাধনের পথও নয়, একে 'মধ্যমপথ' বলা হয়েছে।

গৌতম অহিংসা আচরণের উপরে গুরুত্ব দিতেন। তাই অন্য কোনো মানুষ বা প্রাণীকে হত্যা বা আঘাত করা উচিত নয় বলে বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন।

বুদ্ধদেব ঈশ্বরকে পূজা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। মূর্তি পূজা, যাগযজ্ঞ এবং বলিপ্রথার বিরোধী ছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলেও আধ্যাত্মিক গুণের তিনি ছিলেন মূর্ত বিগ্রহ। তিনি নৈতিকতাপূর্ণ জীবনযাপনের উপরে গুরুত্ব দিতেন বেশী।

বৌদ্ধসংঘ ঃ

সংঘ গঠনের প্রতি বুদ্ধদেব বেশী গুরুত্ব দিতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বৌদ্ধ সংগঠন তৈরি করতেন। এই বৌদ্ধ সংঘভুক্ত সন্ন্যাসীরা সংঘবদ্ধভাবে বৌদ্ধবিহারে থাকতো। বৌদ্ধবিহারগুলিতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ধর্মচর্চা ও ধ্যান করতেন। এই বৌদ্ধবিহারগুলিও শিক্ষা দানের কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধদের এখানে শিক্ষা দেওয়া হতো ও বৌদ্ধধর্মের প্রচারও করা হতো। বৌদ্ধসংঘে যোগ দিতে হলে মাথা মুণ্ডন ও গৈরিক বস্ত্র পরে আবৃত্তি করতে হতো—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি,
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থকে ত্রিপিটক বলা হয়।

সারনাথ বৌদ্ধস্তূপ

বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য কিছু রাজা ও বণিকরা অর্থ দান করে বিহার (মঠ) ও কীর্তিস্তম্ভ তৈরি করতো। ভারতের সারনাথ সাঞ্চি, বুদ্ধগয়া এবং ওড়িশার ধৌলি রত্নগিরি, ললিতগিরি, উদয়গিরি লাঙ্গুড়ি প্রভৃতি পাহাড়ে বৌদ্ধস্তূপ এবং বিহারগুলি রয়েছে। স্তূপগুলি বৌদ্ধ শিল্পকলার এক প্রধান নিদর্শন।

বৌদ্ধধর্ম সমগ্র ভারত ও ভারতের বাইরে তিব্বত, চীন, জাপান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রসারিত হয়েছিল। এই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা পরবর্তী সময়ে দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায় যথা, হীনযান ও মহাযান।

স্তূপের আকার কেমন ? একে বৌদ্ধরা কিসের জন্য ব্যবহার করতো, তথ্য সংগ্রহ কর।

অভ্যাস

১. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির ৫০টি শব্দে উত্তর দাও।**

ক) 'উপনিষদ' থেকে আমরা কী জানতে পারি?

খ) উপনিষদ কোন বিষয়ের উপরে আলোচনা করা হয়েছে?

গ) কঠোপনিষদে কোন বিষয়ের উল্লেখ আছে?

ঘ) পার্শ্বনাথ কে? তাঁর বাণী কী?

ঙ) মহাবীরের জন্মবৃত্তান্ত প্রদান কর।

চ) জৈনধর্মের প্রসারতার কারণ কী?

ছ) মহাবীর জিন কর্মবাদ উপরে কী বলেছেন?

জ) জৈন 'পঞ্চমহাব্রত' বলতে কী বোঝায়?

ঝ) জৈন ধর্মের কীর্তিসম্বলিত কয়েকটি স্থানের নাম লেখো।

ঞ) বুদ্ধদেবের জন্ম ও বাল্যাবস্থা বর্ণনা কর।

ট) গৌতম কেন গৃহত্যাগ করেছিলেন?

ঠ) গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত হলেন কেন?

ড) বুদ্ধদেব তাঁর ধর্ম কিভাবে প্রচার করেছিলেন?

ঢ) বুদ্ধ ধর্মের সত্যগুলি কী?

ণ) আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ কী?

২. **নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য চারটি করে সম্ভাব্য উত্তর রয়েছে। তার মধ্যে উপযুক্ত উত্তরটি বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো।**

ক) অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ থেকে ———— লাভ করেছিল

(ক) কর্মজ্ঞান (খ) শাস্ত্রজ্ঞান (গ) ব্রহ্মজ্ঞান (ঘ) সৃষ্টিজ্ঞান

খ) যা অধ্যয়ন করলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় তাকে ———— বলে।

(ক) ব্রাহ্মণ (খ) উপনিষদ (গ) আরণ্যক (ঘ) বেদ।

গ) ভারতীয় দার্শনিক ———— অদ্বৈতবাদের প্রবর্তক।

(ক) শঙ্করাচার্য (খ) বল্লভাচার্য (গ) মাধ্বাচার্য (ঘ) রামানুজ।

ঘ) জৈনধর্ম প্রসারের জন্য রাজা — বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

(ক) বিন্দুসার (খ) অজাতশত্রু (গ) অশোক (ঘ) খারবেল।

ঙ) — শ্রেণীর জৈন সন্ন্যাসীরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন।

(ক) দিগম্বর (খ) শ্বেতাম্বর (গ) আজিবীক (ঘ) নির্গন্থ

চ) সারনাথে বুদ্ধদেব — জন শিষ্যকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

(ক) ২ (খ) ৫ (গ) ১১ (ঘ) ২৩

ছ) ওড়িশাতে বৌদ্ধকীর্তি — তে রয়েছে।

(ক) রত্নগিরি (খ) খণ্ডগিরি (গ) নিয়মগিরি (ঘ) মহেন্দ্রগিরি।

৩. **নিম্নোক্ত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দু'টি বাক্যে দাও।**

(ক) ভারতীয় ঋষি ও মহর্ষিরা কীভাবে উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন?

(খ) মহাবীরের আগে ক'জন জৈন তীর্থঙ্কর ছিলেন? প্রথম ও মহাবীরের আগের তীর্থঙ্করের নাম লেখ।

(গ) 'জিন' শব্দের অর্থ কী? মহাবীরের প্রচারিত ধর্মকে কী বলা হয়?

(ঘ) মহাবীর কোথায় দেহত্যাগ করেন?

(ঙ) মহাবীর কর্মবাদ সম্বন্ধে কী বলেছিলেন?

(চ) বুদ্ধদেবকে গৌতম বুদ্ধ বলা হয় কেন?

(ছ) বুদ্ধদেব কোশল রাজ্য ও কপিলাবস্তু রাজ্যে কাদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন?

(জ) 'ত্রিপিটক' বলতে কী বোঝায়?

৪. **প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর এক একটি বাক্যে লেখো।**

(ক) উপনিষদে আলোচিত জটিল তত্ত্বগুলি কী?

(খ) উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের কথোপকথন কার কার মধ্যে হয়েছে?

(গ) 'জৈন' ধর্মের মূল মন্ত্র কী?

(ঘ) জৈন ধর্মাবলম্বীরা কত ভাগে বিভক্ত হয়েছিল?

(ঙ) 'মহাভিনিষ্ক্রমণ'-এর অর্থ কী?

(চ) 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' বলতে কী বোঝায়?

৫. 'ক' স্তম্ভের শব্দগুলির সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের সম্পর্কিত শব্দকে দাগ টেনে যুক্ত কর।

'ক' স্তম্ভ	খ' স্তম্ভ
মধ্যম পথ	জৈন মন্দির
আবু পর্বত	জৈন ধর্ম
নচিকেতা	উপনিষদ
	বৌদ্ধধর্ম

তোমার কাজ :

বিভিন্ন বৌদ্ধ কীর্তির চিত্র সংগ্রহ করে একটি অ্যালবাম প্রস্তুত কর।

সপ্তম অধ্যায়

পারস্য ও গ্রীক আক্রমণ

সুমিত তার বাবার সঙ্গে দিল্লী বেড়াতে যাওয়ার ফলে লালকেল্লায় সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেড দেখার সুযোগ পেল। আমাদের সৈন্যবাহিনীর জোয়ানরা প্যারেডে মার্চ করছে, তা দেখল। প্যারেড দেখার পরে জওয়ানদের বিষয়ে জানার জন্য সুমিত আগ্রহী হল। তাই সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা ''সৈন্যদের কাজ কী?'' বাবা তাকে বুঝিয়ে বলল বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে আমাদের দেশকে তারা তাদের প্রাণের বিনিময়ে রক্ষা করে। আমাদের দেশ প্রাচীন কাল থেকেই বিদেশীদের দ্বারা অনেকবার আক্রান্ত হয়েছে। সুমিত সেই প্রাচীনকালের আক্রমণকারীদের সম্পর্কে জানতে চাইল। সে সম্পর্কে তার বাবা বললেন,

অতীতে ভারতবর্ষ ধনসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। তাই ভারতকে বলা হতো সোনার দেশ। এই বিরাট ধনসম্পদ নিজের অধীনে আনা ও নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করার উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু বৈদেশিক শক্তি ভারত আক্রমণ করেছিল। সে সব দেশের মধ্যেছিল পারসিক ও গ্রীক।

পারসিক আক্রমণ

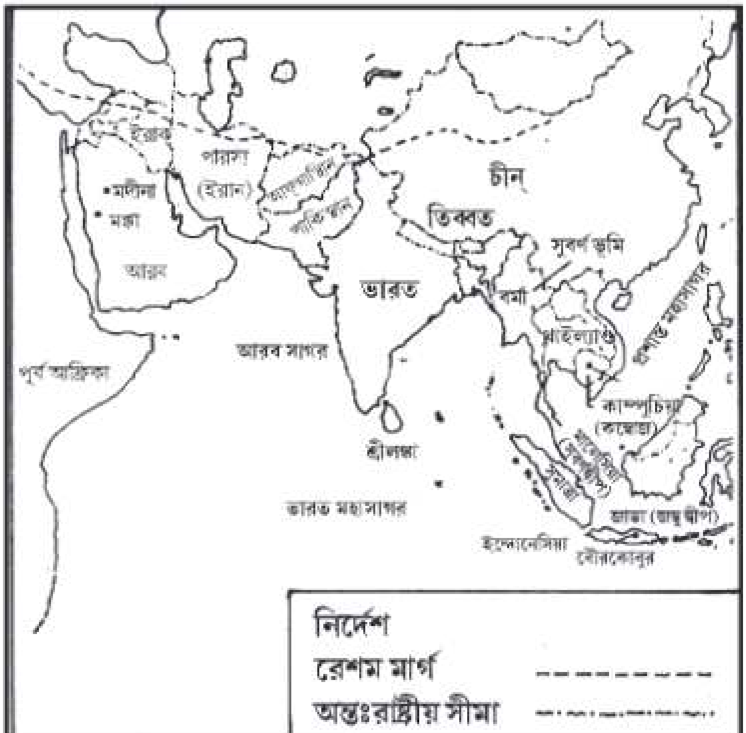

খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মধ্য এশিয়ার পারস্য দেশে (অধুনা ইরান) এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই দেশে একামেনিড শাসকদের দ্বারা শাসিত ছিল। পারস্যের সম্রাট প্রথম ডেরায়স্ খ্রীঃ পূঃ ৫২২-এ পারস্যের শাসনভার গ্রহণ করলেন। ভারতের ধনসম্পদের লোভে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল আক্রমণ করলেন। সে অঞ্চলে কোনো শক্তিশালী শাসক না থাকায় ডেরায়স্ সে অঞ্চলের

অন্তর্গত। পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ও সিন্ধুনদীর পশ্চিমাঞ্চল দখল করে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিতে সাহায্য করেছিলেন। পারস্য অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলটি সবচেয়ে বেশি উর্বর ও জনবহুল ছিল। পারস্যের রাজারা এই অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে কর আদায় করতেন। আলেকজান্ডার পারস্য আক্রমণ করা পর্যন্ত এ অঞ্চল পারস্য রাজাদের অধীনে ছিল। ডেরায়সের পরে রাজা জেরকসস্ ভারতীয়দের পারস্য সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্তি দিয়ে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

পারসিক আক্রমণের প্রভাব ঃ

ভারতের সঙ্গে পারস্য দেশের সম্পর্ক প্রায় ২০০ বছর। এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক জল ও স্থল পথ উভয় দিকেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্যদের প্রভাব ছিল বেশি। পারস্যবাসীদের কাছে ভারতীয়রা এক নতুন লিপি আয়ত্ত করে তার নাম খরোষ্ঠি। এই লিপির অক্ষরগুলি ডানদিক থেকে বাঁদিকে লিখতে হাত। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অশোকের কিছু শিলালিপি এই খরোষ্ঠি লিপিতে লেখা।

অশোকের দ্বারা নির্মিত স্তম্ভগুলিতে পারস্য সভ্যতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অশোকের অনুশাসনগুলিতে পারসিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। অনুমান করা হয় যে, পারস্যদের কাছে ভারতের বিরাট ধনসম্পদের সংবাদ পেয়ে গ্রীকরা ভারত আক্রমণ করে।

এশিয়ার মানচিত্র দেখে প্রাচীন পারস্য কোথায় অবস্থিত ছিল, চিহ্নিত কর এবং সে দেশ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করো।

গ্রীক আক্রমণ ঃ

আলেকজান্ডার খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬-তে গ্রীসের ম্যাসিডোনিয়া নামক এক ছোট্ট রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ফিলিপ ছিলেন ম্যাসিডন রাজ্যের রাজা। শৈশবে আলেকজান্ডার প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের নিকট শিক্ষালাভ করেন। পিতা ফিলিপের মৃত্যুর পরে মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসন আরোহণের কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পারস্য, সিরিয়া মিশর, আফগানিস্তান ও এশিয়া মাইনর প্রভৃতি নগর অধিকার করেন। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য তাঁকে আলেকজান্ডার দি গ্রেট বলা হয়। সমগ্র পৃথিবী জয় করার স্বপ্ন তিনি দেখতেন।

খ্রীঃ পূঃ ৩৩৪-এ নিজের চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আলেকজান্ডার এশিয়া মাইনর আক্রমণ করেন। এরপর পারস্য অভিমুখে গমন করেন ও পারস্যের সম্রাট তৃতীয় ডেরায়সকে পরাজিত করেন। আলেকজান্ডার সিরিয়া ও মিশরও আক্রমণ করেন। পারস্য অধীনস্থ মিশরকে মুক্ত করে সেখানে 'আলেকজান্ড্রিয়া' নগর স্থাপন করেন।

খ্রীঃ পূঃ ৩২৬ সালে আলেকজান্ডার ভারত অভিমুখে অভিযান আরম্ভ করেন। তিনি খাইবার

গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সীমান্ত প্রদেশগুলি আক্রমণ করলেন। সে সময় ভারতে উত্তর পশ্চিমে গান্ধার কম্বোজের মত অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। কিন্তু এই সব ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে একতা ছিল না। ওরা নিজেদের মধ্যে অনবরত কলহে লিপ্ত থাকত। সিন্ধু ও বিতস্তা নদীর মাঝে অবস্থিত তক্ষশিলা গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নদীর অপর পার্শ্বে পৌরব বংশ রাজত্ব করত। এই রাজ্যের নাম কিংবা রাজধানীর নাম অদ্যাবধি জানা যায়নি।

ভারতের উত্তর পশ্চিমের রাজ্যগুলির মধ্যে কয়েকটি রাজ্য আলেকজান্ডারের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। তক্ষশীলার রাজা অম্বিও আলেকজান্ডারকে প্রতিরোধ না করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু পৌরব রাজ্যের রাজা পুরু তাঁর বশ্যতা স্বীকার না করে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। উভয় সৈন্যদের মধ্যে এই ভয়ংকর লড়াইকে হাইদাসপোস যুদ্ধ বলা হয়।

এই যুদ্ধে আলেকজান্ডার বিজয়ী হলেন। গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও পুরু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিলেন। অবশেষে আলেকজান্ডারের কাছে বন্দী হলেন পুরু। বন্দী পুরুকে আলেকজান্ডার যখন জানতে চাইলেন 'তাঁর কাছে পুরু কেমন ব্যবহার আশা করেন।' নির্ভীক পুরু উত্তর দিলেন "একজন রাজা যেমন অন্য রাজার নিকট যেরকম ব্যবহার আশা করেন তিনিও তদ্রূপ ব্যবহার আশা করেন।"

পুরু ও আলেক্‌জেণ্ডার

এক ভারতীয় রাজার এই প্রকার সাহস ও বীরত্ব দেখে আলেকজান্ডার মুগ্ধ হলেন। তিনি শুধু পুরুর জীবন রক্ষাই করেননি, তাঁকে সসম্মানে তার রাজ্য ফিরিয়েও দিয়েছিলেন। সেখান থেকে আলেকজান্ডার পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে আরও রাজ্যজয় করার অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু তাঁর যুদ্ধক্লান্ত সৈন্যরা আর যুদ্ধ করতে চাইলেন না। এছাড়া মগধের শক্তিশালী নন্দ সাম্রাজ্যকে প্রতিহত করার মত আত্মবিশ্বাস গ্রীক সৈন্যরা হারিয়ে ফেলেছিল। কাজেই বাধ্য হয়ে আলেকজান্ডার দেশ জয়ের আশা পরিত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন। দেশে ফিরে যাওয়ার পথে ব্যাবিলনে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ শতাব্দীতে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে গ্রীক বীর আলেকজান্ডার মৃত্যুবরণ করেন।

আলেকজান্ডারের মত আরও কয়েকজন দিগ্বিজয়ী বীরের নাম সংগ্রহ করে একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

আলেকজান্ডারের আক্রমণের প্রভাব ঃ

আলেকজান্ডারের আক্রমণের ফলাফল সুদূরপ্রসারীই হয়েছিল। তাঁর আক্রমণ ভারতীয় সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। যথা ঃ

- আলেকজান্ডারের আক্রমণ ভারতে রাজনৈতিক স্থিরতা ও একতা আনতে সাহায্য করে। আলেকজান্ডারের পরে ভারতে এক বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- এই আক্রমণের ফলে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।
- ভারত ও গ্রীসের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হল।
- আগে ভারত ও গ্রীসের মধ্যে একমাত্র স্থলপথের সুবিধা ছিল। এই আক্রমণের ফলে আরও ৩টি স্থলপথ ও একটি জলপথ গমনাগমনের জন্য তৈরি হল।
- ভারত ও গ্রীক শিল্পের মিশ্রণে ''গান্ধার শিল্প'' আলেকজান্ডারের আক্রমণের পরোক্ষ ফল।
- মোটের উপর বলা যায়, আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হল।

অভ্যাস

১. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির ৫০টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও।

(ক) পারস্য সম্রাট প্রথম ডেরায়াস কেন ভারত আক্রমণ করেন?

(খ) আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন কেন?

(গ) পুরু কে? আলেকজান্ডারের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ছিল?

(ঘ) আলেকজান্ডারের আক্রমণের ফলে ভারতের উপরে তার কী প্রভাব পড়েছিল?

(ঙ) খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের কোন রাজা ভারত আক্রমণ করেন ও কেন?

২. বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ কর।

(ক) তক্ষশীলা ———— রাজ্যের রাজধানী ছিল।

(কাম্বোজ, মগধ, গান্ধার, পঞ্জাব)

(খ) ডেরায়স ———— তে পারস্যের শাসনভার গ্রহণ করেন।

(খ্রীঃ পূঃ ৪৬৮, খ্রীঃ পূঃ ৫২২, খ্রী পূঃ ৩২২, খ্রীঃ পূঃ ৪২৭)

(গ) আলেকজান্ডার ———— বছরে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

(১৭ বছর, ১৮ বছর, ১৯ বছর, ২০ বছর)

৩. একটি বাক্যে উত্তর দাও।

(ক) ফিলিপ কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন?

(খ) আলেকজান্ডারের শিক্ষাগুরু কে?

(গ) আলেকজান্ডার প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম কী?

(ঘ) অম্বি কোন্ দেশের রাজা ছিলেন?

(ঙ) উত্তর ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা কে ছিলেন?

(চ) ভারতীয়রা পারস্যদের কাছে কোন্ লিপি শিখেছিল?

তোমার কাজ :

বিভিন্ন দিগ্বিজয়ী সম্রাটদের চিত্র সংগ্রহ করে তাঁদের বিষয়ে বিবরণী প্রস্তুত কর।

অষ্টম অধ্যায়

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের উত্থান

মিতালি তার টেবিলের উপরে এক টাকা, দু'টাকা, পাঁচ টাকার মুদ্রার সঙ্গে পাঁচ টাকার নোট, দশ টাকার নোট ছড়িয়ে রেখে ছিল। তার বাবা ঘরে ঢুকে টেবিলের উপরে ছড়িয়ে থাকা টাকাগুলো দেখল এবং মিতালিকে জিজ্ঞেস করল, ''মিতা—টাকাগুলো এভাবে কেন রেখেছ? মিতালি বলল, ''বাবা, আমি দেখছি প্রত্যেক মুদ্রা ও টাকাতে তিনটি সিংহের চিহ্ন রয়েছে। এই চিত্রটি কোথাকার এবং কেন এই সব মুদ্রা ও টাকাতে রয়েছে? মিতালিকে তার বাবা বুঝিয়ে বললেন—

প্রাচীনকালে উত্তর ভারতে মগধ নামে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল। এই সাম্রাজ্য দু'শ বছর টিকেছিল। সেখানে মৌর্য বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। পূর্বে সেখানে নন্দ বংশের রাজত্ব ছিল। নন্দ বংশেব রাজারা নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন। তাদের অত্যাচারে রাজ্যবাসী সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ফলে তার লোকপ্রিয়তা হারিয়েছিল। চাণক্য নামক এক কূটানভিজ্ঞ পণ্ডিত মগধ থেকে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধনের জন্য শপথ নিয়েছিলেন। শপথ কার্যকারী করার জন্য সুযোগের সন্ধানে ছিলেন তিনি। ঠিক এই সময় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ছিলেন মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। চন্দ্রগুপ্তের বুদ্ধি, সাহস ও চাতুর্য দেখে চাণক্য বিস্মিত হন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের সাহায্য নিয়ে মগধ থেকে নন্দ সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মনে মনে স্থির করলেন। মগধ আক্রমণ করার জন্য তিনি চন্দ্রগুপ্তকে মন্ত্রণা দিলেন। বর্তমান পঞ্জাব অঞ্চলের দুর্ধর্ষ জাতি ও উপজাতির লোকদের নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত, এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী তৈরি করলেন। অবশেষে সেই সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজিত হন রাজা নন্দ। নন্দবংশের পতন হলে মগধের রাজ সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্ত আরোহণ করে মৌর্যবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন।

একজন শাসকের লোকাপবাদের কারণ কী? তা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

মৌর্য সাম্রাজ্য ও শাসন সম্বন্ধীয় সব তথ্য মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থ ও অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঃ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দ রাজা ধননন্দকে পরাস্ত করে মগধে মৌর্য শাসন আরম্ভ করেন। এই সময় আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাস নিকতার ভারতের গ্রীক অধিকৃত অঞ্চলে শাসন করত। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে সেলুকাস পরাজিত হন। হেরে গিয়ে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য

হন। সন্ধি অনুযায়ী গ্রীক অধিকৃত আফগানিস্তান (কাবুল, কান্দাহার ও হেরাত) বেলুচিস্তান প্রভৃতি ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিশে যায়। এর ফলে সেই সব অঞ্চলে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটে। তিনি পশ্চিম ভারতের গুজরাট অন্তর্গত সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল নিয়ে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্য উত্তর পশ্চিমে পারস্য পর্যন্ত, পূর্বে বিহার, পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র এবং দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র যা বিহারের পাটনার সঙ্গে চিহ্নিত করা হয়। তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ২৯৮ শতকে তাঁর মৃত্যু হয়।

চাণক্য ঃ

মৌর্য বংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন চাণক্য, তিনি 'কৌটিল্য' নামেও পরিচিত হন। 'অর্থশাস্ত্র' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে তিনি প্রসিদ্ধ লাভ করেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসন পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধীয় অনেক বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর এই গ্রন্থে।

চাণক্য

মেগাস্থিনিস ঃ

মেগাস্থিনিস আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাসের রাজ দূত ভাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায় প্রেরিত হন। তিনি সেই দরবারে পাঁচ বছর ছিলেন। এই সময় তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন। 'ইণ্ডিকা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। তাঁর লিখিত সেই গ্রন্থ থেকে সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অবগত হওয়া যায়। এছাড়া মৌর্য রাজপ্রসাদ এবং পাটলীপুত্র নগরের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন ঐ গ্রন্থে।

বিন্দুসার ঃ

চন্দ্রগুপ্তের পরে তাঁর পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন পরাক্রমশালী সম্রাট। পিতার বিশাল সাম্রাজ্য দক্ষতার সঙ্গে শাসন করতেন। গ্রীকরা তাঁকে 'অমিত্রঘাত' উপাধি প্রদান করেন। তিনি তাঁর রাজত্বকালে ১৬জন রাজাকে পরাস্ত করে তাঁদের রাজ্য নিজের রাজ্যের সঙ্গে মিশিয়ে বিশাল সাম্রাজ্যের আধিকারী হন।

অশোক ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ শতকে বিন্দুসারের পরে অশোক মগধের সম্রাট হন। বাল্যাবস্থা থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক সাহসী ও নিষ্ঠুর। তাঁর নিষ্ঠুর প্রকৃতির জন্য তাঁকে 'চণ্ডাশোক' বলা হত। বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশীলার বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেই বিদ্রোহ দমন করার জন্য রাজকুমার অশোককে সেখানে পাঠানো হয়। অশোক বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হওয়ায় তক্ষশীলা ও উজ্জয়িনীর প্রাদেশিক শাসনকর্তারূপে তিনি নিযুক্ত হন। অশোক বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে মগধের সম্রাট হলেও তাঁর রাজ্যাভিষেক হয় সিংহাসন আরোহণের চার বছর পরে।

কলিঙ্গ যুদ্ধ ঃ

সুবর্ণরেখা নদী থেকে গোদাবরী নদী পর্যন্ত সুবিস্তৃত পূর্ব সাগর কূলবর্তী অঞ্চল কলিঙ্গ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলিঙ্গ ছিল প্রাচীন ভারতের এক শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্র। অশোক নিজ সাম্রাজ্যের পাশাপাশি কোনো রাজ্যের স্বাধীনতা সহ্য করতে পারতেন না।

অশোকের অনুশোচনা

এই কলিঙ্গ রাষ্ট্র (বর্তমান ওড়িশা রাজ্য) ছিল বিপুল ঐশ্বর্যশালী ও বাণিজ্য কারবারের পীঠস্থলী। মগধ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করেছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ২৬১ তে অশোক কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। অনেকের মতে শক্তিশালী কলিঙ্গ বাহিনীর কাছে ভুবনেশ্বরের দয়ানদী কূলে অবস্থিত ধৌলি পাহাড়ের নিকটে অশোকের সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু অশোকের প্রবল পরাক্রমশালী সৈন্যদলের কাছে তাঁরা পরাজিত হন ও আনুগত্য স্বীকার করেন। এই যুদ্ধে এক লক্ষ লোক নিহত হয় ও দেড় লক্ষ লোককে বন্দী করা হয়। ঐ কলিঙ্গ যুদ্ধে নরহত্যা রক্তপাত আহত সৈন্যদের আর্তনাদে অশোকের মনোভাবের পরিবর্তন হয়। এবং জীবনে তিনি আর কখনও যুদ্ধ করবেন না বলে শপথ নেন ও অস্ত্র ত্যাগ করেন। এর পর থেকেই তিনি রাজ্যবিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ে আত্মনিয়োগ করেন।

অধুনা ভুবনেশ্বরের ধৌলির কাছে অশোকের সমকালীন যে কীর্তি দেখতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ে অন্যদের কাছে জেনে লেখো।

অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও প্রচার ঃ

কলিঙ্গ যুদ্ধের ফলে অশোকের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কলিঙ্গযুদ্ধে নিহত সৈন্যদের রক্তস্রোত দেখে যুদ্ধে তিনি বীতশ্রদ্ধ হন এবং এর ফলেই তিনি চণ্ডাশোক থেকে 'ধর্মাশোকে' রূপান্তরিত হন। এই যুদ্ধের পরে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার উন্নতি ও প্রচারের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন। বৌদ্ধধর্মের অহিংসা নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে সেই অহিংসা ভাব তিনি মনপ্রাণ দিয়ে প্রচার করেছেন।

অশোক ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে লুম্বিনী, সারনাথ, কুশীনগর (কুশীনারা) ইত্যাদি জায়গায় গিয়েছিলেন। তাঁর এই যাত্রা ধর্মযাত্রা নামে খ্যাত। বৌদ্ধধর্মের প্রধান পীঠস্থানগুলি দর্শনের ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে যুগের অনেক তীর্থযাত্রী এই ধর্ম গ্রহণ করতেন।

শিলালিপি ঃ

অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য অনেক স্তম্ভ, স্তূপ, বিহার, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করেছিলেন। ভুবনেশ্বরের কাছে ধৌলি পাহাড়ে তাঁর এক শিলালেখ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর আর একটি শিলালেখ গঞ্জাম জেলার জৌগড়ে আছে। তাঁর নির্দেশে শিলাস্তম্ভগুলিতে খোদিত লেখার বিষয়বস্তু হল প্রজা ও রাজকর্মচারীদের প্রতি উদ্দিষ্ট অনুশাসন। এটি তার প্রবর্তিত 'ধম্ম' নীতি সূচিত করে। 'ধম্ম' অর্থ কোনো এক নির্দিষ্ট ধর্ম নয়। অশোক তাঁর অনুশাসনে জনসাধারণকে তাদের কর্তব্যের প্রতি সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে নীতিগুলি খোদাই করেছিলেন। ওই নীতিগুলি হল—(১) জীব হত্যা না করা (২) সর্বজীবে অহিংসা ভাব-প্রদর্শন করা (৩) পিতামাতা গুরুজনদের আদেশ উপদেশ পালন করা (৪) গুরুজনদের ভক্তি করা (৫) বন্ধুবর্গ, আত্মীয়স্বজন, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও বিপদগ্রস্তদের প্রতি উত্তম আচরণ প্রদর্শন করা (৬) দাসদাসী বা চাকরদের প্রতি দয়া প্রদর্শন (৭) অসত্য কথা না বলা সত্য কথা বলা, (৮) অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জন না করা ইত্যাদি। প্রেম ও মৈত্রীভাবনা দ্বারা চিত্ত জয় করা যায়। সেজন্য সকলের মৈত্রীভাব সাধন করা আবশ্যক।

ধর্মমহামাত্র ঃ

অশোক 'ধর্মমহামাত্র' নামক কর্মচারীদের ধর্মপ্রচারের কাজে নিযুক্ত করতেন। এই ধর্মমহামাত্ররা সারা দেশ ভ্রমণ করে লোকেদের তাঁর প্রদর্শিত ধম্ম নীতি শোনাত এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য 'ধম্ম' নীতির বিষয়ে আলোচনা করতো। এছাড়াও অশোক রাজুক, প্রাদেশিক ও যুক্ত নামক কর্মচারীদের নিয়োগ করেছিলেন। এরা প্রজাদের কল্যাণের জন্য নানা রকমের কাজ করতো।

লোকহিতকর কার্য ঃ

অশোক প্রজাদের কল্যাণের জন্য অনেক জনহিতকর কার্য করেছিলেন। লোকেদের যাতায়াতের জন্য তিনি রাস্তাঘাট তৈরি করেছিলেন এবং পথিকদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে ছায়াপ্রদানকারী অনেক গাছ লাগিয়েছিলেন। প্রজাদের স্বাস্থ্যের কথা মনে রেখে অনেক জায়গায় ওষুধ জাতীয় বৃক্ষলতার বাগান তৈরি করেছিলেন। সাধারণ মানুষের পানীয় জলের যাতে অভাব না হয় সেজন্য কূপ খনন করেছিলেন এবং পথিকদের বিশ্রামের জন্য পান্থশালা নির্মাণ করেছিলেন। মানুষ ও পশুদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসাগার স্থাপন করেছিলেন।

অশোকের শিলা ও স্তম্ভ লেখা থেকে সম্রাট অশোকের যে পরিচয় তুমি পাও, তা লেখ।

বহির্দেশের সঙ্গে সম্পর্কঃ

নন্দনগড়ের অশোক স্তম্ভ

মৌর্য শাসকেরা ভারতের বাইরের দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। অশোকের প্রচেষ্টায় পশ্চিম এশিয়ার জনসাধারণের ভিতরে 'ভ্রাতৃত্ব' অহিংসা ও শান্তি প্রভৃতি মানবিক নীতিগুলির মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়। তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসার ও মৈত্রী ভাব বিস্তারের জন্য নিজের পুত্র ও কন্যাকে সিংহলে পাঠিয়েছিলেন। সর্বদা অন্যকে নিজের মত ভালবাসার উপদেশ দিতেন। তেমনি শোন ও উভর নামক দু'জন বৌদ্ধ ভিক্ষুককে পাঠিয়েছিলেন ব্রহ্মদেশে (থাইল্যাণ্ড, বর্মা)।

অশোক স্তম্ভ

অশোক স্তম্ভ ঃ

অশোক কলা স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি অনেক প্রাসাদ, স্তূপ, স্তম্ভ, বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেগুলির মধ্যে সারনাথের স্তম্ভ প্রধান ও সর্বপ্রাচীন। এই স্তম্ভের শীর্ষদেশে চারটি সিংহ আছে। চারদিকেই এদের মুখ। ভারত সরকার অশোকস্তম্ভের এই সিংহকে জাতীয় সঙ্কেত রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই চিহ্নের মধ্যিখানে অবস্থিত ধর্মচক্রটি ভারতের জাতীয় পতাকায় অঙ্কিত রয়েছে। এই (অশোক স্তম্ভ) সিংহ চিহ্নটি ভারতীয় মুদ্রাতেও স্থান পেয়েছে। এই স্তম্ভের উচ্চতা ২.১৫ মিটার। এই অশোক স্তম্ভে চারটি সিংহ, একটি ঘোড়া, একটি হাতি ও একটি ষাঁড়ের চিত্র আছে। এর ধর্মচক্রটি সত্যের প্রতীক, এতে ২৪টি অর রয়েছে। (অর-চাকার পখি)

আমাদের জাতীয় পতাকার একটি চিত্র এঁকে উপযুক্ত রং দাও।

অভ্যাস

১. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির ৫০টি শব্দে উত্তর দাও।

ক) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কীভাবে নন্দবংশ লোপ করে মগধে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

খ) সেলুকাস নিকতার কে? চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের পরিণতি কী হয়েছিল?

গ) চাণক্য লিখিত 'অর্থশাস্ত্রে' কোন বিষয়ের উল্লেখ আছে?

ঘ) মেগাস্থিনিস কে ? তাঁর বিবরণীতে কোন বিষয়ের উল্লেখ আছে ?

ঙ) কলিঙ্গ যুদ্ধের কারণ ও পরিণতি কী হয়েছিল ?

চ) কলিঙ্গ যুদ্ধ অশোকের মনে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল কেন ?

ছ) অশোকের 'ধম্ম' নীতি কী ?

জ) অশোক কোন্ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই ধর্ম প্রসারের জন্য কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ?

২. সংক্ষেপে এগুলির বিষয়ে লেখো।

অশোকের শিলালিপি, অশোক স্তম্ভ, ধর্মমহামাত্র।

৩. প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দুটি বাক্যে লেখো।

ক) চন্দ্রগুপ্ত কাদের নিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন ?

খ) অশোক কলিঙ্গ আক্রমণের দুইটি কারণ কী ?

গ) বিন্দুসার তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন করার জন্য কাকে পাঠিয়েছিলেন ?

ঘ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্য কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ?

৪. প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর এক একটি বাক্যে লেখো।

ক) অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য নিজের পুত্র ও কন্যাকে কোথায় পাঠিয়েছিলেন ?

খ) অশোক স্তম্ভের মাঝখানে থাকা চক্রকে কী বলা হয় ?

গ) অশোকের নিষ্ঠুর প্রকৃতির জন্য তাঁকে কী বলা হতো ?

ঘ) কলিঙ্গ যুদ্ধ কবে হয়েছিল ?

ঙ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কাকে পরাস্ত করে মগধের শাসক হয়েছিলেন ?

৫. প্রত্যেক উক্তিতে থাকা ভুল সংশোধন কর।

ক) গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের সেনাপতি ছিলেন মেগাস্থিনিস।

খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য চাণক্যকে সেনাপতিরূপে নিযুক্ত করেছিলেন।

গ) অশোক 'ধর্মমহামাত্র'-দের যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

ঘ) অশোক স্তম্ভে চারটি বাঘের চিত্র রয়েছে।

৬. বন্ধনীর মধ্যে থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক) মগধে নন্দবংশ ধ্বংস করার জন্য ———— শপথ নিয়েছিলেন।

(চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, চাণক্য, সেলুকাস নিকতার)

খ) মেগাস্থিনিস গ্রীকের ———— ছিলেন।

(রাজদূত, রাজা, সেনাপতি, ধর্মপ্রচারক)

গ) অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধে ———— লোককে বন্দী করেছিলেন।

(পঞ্চাশ হাজার, এক লক্ষ, দেড় লক্ষ, দুই লক্ষ)

ঘ) সত্যের প্রতীক ধর্মচক্রে ———— টি অর আছে।

(১২, ২৪, ২০, ২১)

৭. 'ক' স্তম্ভের প্রত্যেক শব্দের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের সম্পর্কিত শব্দগুলির সঙ্গে মিলিয়ে লেখো।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
ইন্ডিকা	চন্দ্রগুপ্ত
ধম্ম	মেগাস্থিনিস
কৌটিল্য	অশোক
	চাণক্য

তোমার কাজ

ওড়িশার মানচিত্র অঙ্কন করে কলিঙ্গ যুদ্ধের স্থান নির্দেশ কর।

নবম অধ্যায়

খ্রীঃ পূঃ ২০০ থেকে খ্রীঃ অঃ ৩০০ সময়ের ভারত

আজ রবিবার। বাবলু সকালে উঠে জলখাবার খেল। এই সময়ে খবরের কাগজওয়ালা খবর কাগজের সঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি দিয়ে গেল। সাপ্তাহিক পত্রিকাতে মৌর্য সম্রাট অশোকের বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প বেরিয়েছে। সেই গল্প পড়ে বাবলু জানতে পারলো যে অশোক একজন সম্রাট ও সুশাসক ছিলেন। এবং অশোকের মৃত্যুর পরে তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীরা তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেনি বলে জানতে পেরে সে ভাবল, অশোকের পরে ভারতের অবস্থা কেমন ছিল? সে অবস্থা জানার জন্য তার পরের দিন সে বিদ্যালয়ের পাঠাগারে গিয়ে ইতিহাস বই পড়ে তা জানতে পারলো।

সে সন্ধান করে জানতে পারল—ভারতে খ্রীঃ পূঃ ২০০-তে মৌর্য সাম্রাজ্যের মতো বড় সামাজ্য গঠিত না হলেও এই সময়ে কেন্দ্র এশিয়া ও ভারতের মধ্যে বহুবিধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মৌর্য শাসন পরে পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে শুঙ্গ, কাণ্ব ও শাতবাহন ইত্যাদি বংশের রাজারা শাসন করার সময় পশ্চিম ভারতে কেন্দ্র এশিয়ার কিছু শাসক শাসন করতেন।

ভারতীয়-গ্রীকদের শাসন ঃ

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর পশ্চিম ভারত একাধিক বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণকারীদের মধ্যে উত্তর আফগানিস্তানের আমদারিয়া নদীর দক্ষিণে অবস্থিত ব্যাকট্রিয় রাজ্যের শাসক গ্রীকরা প্রথমে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ভারতে আগমন করে। এই আক্রমণকারীরা বিভিন্ন সময়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন নিজেরাই সেখানে শাসন করতেন ও আর কিছু জাতি সেখানে নিজেদের জন্য শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন।

শক জাতির লোকেদের প্রবল অত্যাচারের জন্য এই অঞ্চলের শাসকগণ পরবর্তী সময়ে নিজের শাসনকার্য চালাতে পারতেন না। এই সময়ে চীনের বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ হওয়ার দরুন শকদের চীনের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। যার ফলে তারা নিজের প্রতিবেশী দেশে যারা শাসন করত সেই গ্রীক ও পল্লব শাসকদের উপরে চাপ দিতে শুরু করলো। শকদের চাপের ফলে ব্যাকট্রিয়র শাসক গ্রীকরা ভারত অভিমুখে অগ্রসর হন।

গ্রীকরা কোন দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল মানচিত্র দেখে স্থির কর।

গ্রীকদের ওই সময়ের শাসক গোষ্ঠী অশোকের দুর্বল উত্তরাধিকারীরা প্রতিরোধ করতে পারেনি। ফলে ব্যাকট্রিয়র শাসক গ্রীকরা প্রথমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অধিকার করে। এবং পরে অযোধ্যা ও পাটলীপুত্র পর্যন্ত অধিকার করে বলে জানা যায়। কিন্তু গ্রীকরা সামগ্রিকভাবে ভারতে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

গ্রীক শাসনকর্তাদের মধ্যে মেনেন্ডর (খ্রীঃ পূঃ ১৬৫-১৪৫) ছিলেন প্রধান। তিনি 'মিলিন্দ' নামেও পরিচিত। তিনি তাঁর রাজধানী পঞ্জাবের 'শাকল' (বর্তমান পশ্চিম পঞ্জাবের শিয়ালকোট) নামক স্থানে স্থাপন করেন। কথিত আছে তিনি বৌদ্ধগুরু নাগার্জুনের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে জানতে চেয়ে নাগার্জুনকে অনেক প্রশ্ন করতেন। মেনেন্ডরের প্রশ্ন ও সে বিষয়ে নাগার্জুনের দেওয়া উত্তর ''মিলিন্দপন্‌হ'' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

ভারতীয়-গ্রীকরা ভারতে অনেকগুলি মুদ্রা প্রথমে প্রচলন করেছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীতে অন্য রাজাদের আমলেও মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল। এছাড়া ভারতে তাঁরা বৌদ্ধ শিল্পকলায় নিজেদের কল্পনা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। একে গান্ধার শিল্পও বলা হয়।

ভারতীয়-গ্রীকদের মুদ্রা

ভারত শাসনকালে গ্রীকরা কালক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসনের সময় গ্রীকদের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র নিকটতর হয়েছিল। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। যার ফলে তারা ভারতীয় বলে পরিগণিত হলো এবং তাদের আসল পরিচয় লোপ পেল।

ছবিতে গ্রীক মুদ্রা এবং আমাদের ব্যবহৃত মুদ্রার মধ্যে কী পার্থক্য দেখছো?

শকদের শাসন ঃ

ভারতীয়-গ্রীকদের পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে শকজাতি সাম্রাজ্য বিস্তার করে। গ্রীকদের চেয়ে শকেরা ভারতের বেশী অঞ্চলে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। শকরা মঙ্গোলিয়াদের এক শাখা। তারা প্রথমে সরদারিয়া নদীর পশ্চিমদিকে বাস করত। তাদের সেখান থেকে ইউচি জাতির লোকেরা বিতাড়িত করায় তারা ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতীয়-গ্রীক রাজ্য অধিকার করে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। শকরা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ভারত ও আফগানিস্তানে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এই ভাগগুলির মধ্যে প্রথম ভাগ আফগানিস্তানে ও দ্বিতীয় ভাগটি ভারতের তক্ষশীলার নিকট নিজেদের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে শাসন করত। তৃতীয় ভাগটি মথুরায় দু'শ বর্ষ ধরে শাসন করেছিল।

চতুর্থ ভাগটি পশ্চিম ভারতে বসবাসকারী খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত শাসন করেছিল এবং পঞ্চম ভাগটি দাক্ষিণাত্যের উপর ভাগে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

ভারতীয় রাজা ও লোকদের কাছে শকরা কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। কিংবদন্তী আছে যে কেবল মাত্র উজ্জয়িনীর এক রাজা শকদের প্রতিরোধ করে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৫৮ সালে শকদের পরাস্ত করে নিজেকে বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত করে বিক্রম সংবৎ বা অব্দ প্রচলন করেছিলেন। তিনি শকাব্দ প্রবর্তক রাজা। তার পরে আরও অনেক রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করে শাসন করতেন। এই প্রথা খ্রীষ্টাব্দ ১৪০০ পর্যন্ত পশ্চিম ভারত ও দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ছিল।

শকজাতি ভারতের বিভিন্ন অংশে শাসন করলেও কেবল পশ্চিম ভারতে তাদের শাসনকাল ছিল মাত্র চারশত বছর। শকরাজাদের মধ্যে রুদ্রদামন (খ্রীঃ অঃ ১৩০-১৫০) ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তিনি মালব, সৌরাষ্ট্র, গুজরাট উত্তর কঙ্কণ উপকূল এবং নর্মদা উপত্যকা অন্তর্গত কিছু রাজ্য অধিকার করেছিলেন। এছাড়া মৌর্য রাজত্বকালে তিনি জলসেচনের জন্য নির্মিত অথচ দীর্ঘদিন অব্যহৃত সুদর্শন হ্রদ সংস্কার করে কার্যোপযোগী করে তোলার জন্য সুনাম অর্জন করেন।

চাষ জমিতে কিভাবে জলসেচন করা হয় তা চিন্তা কর ও বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

রুদ্রদামন সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। শুধু তাই নয়; তিনি বিদ্বান পণ্ডিতদের সমাদর করতে জানতেন। ব্যাকরণ, রাজনীতি, সঙ্গীত ও দর্শন বিভাগে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল বলে সেই সময়ের এক প্রাচীন শিলালিপি থেকে জানা যায়। তিনি তাঁর ভারত শাসনকালের ভিতরে শাতবাহন, লিচ্ছবী ইত্যাদি রাজ পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। শকজাতির লোকেরা ভারতীয়দের রীতিনীতি ও চালচলনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল এবং ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে গ্রীকদের মত পুরোপুরি ভাবে ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল।

কুশান রাজত্ব ঃ

যীশুখ্রীষ্ট জন্মের পূর্ববর্তী দু'শ বছরের মধ্যে এশিয়া ভূখণ্ডে বিভিন্ন জাতির লোকেরা প্রবেশ করে। এদের মধ্যে তিনটি জাতি যথা ঃ শক, পল্লব এবং ইউচি প্রধান। এদের আগমনের ফলে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রীকদের আধিপত্য ধীরে ধীরে লোপ পায়। এই জাতিগুলির মধ্যে ইউচি জাতি পাঁচটি শাখায় বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে কুশান শাখাই প্রধান। কুশান বংশ ইউচি জাতির একটি শাখা।

কুশানদের উৎপত্তি বিষয়ে চীন ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ থেকে অনেক কিছু জানা যায়। এই তথ্য অনুসারে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীন দেশের পশ্চিম দিকে ইউচি নামক একটি শক্তিশালী যাযাবর জাতি বাস করত। হুন নামক অন্য এক শক্তিশালী যাযাবর জাতি এদের বিতাড়িত করে।

কুশাণ এবং সাতবাহন রাজ্য

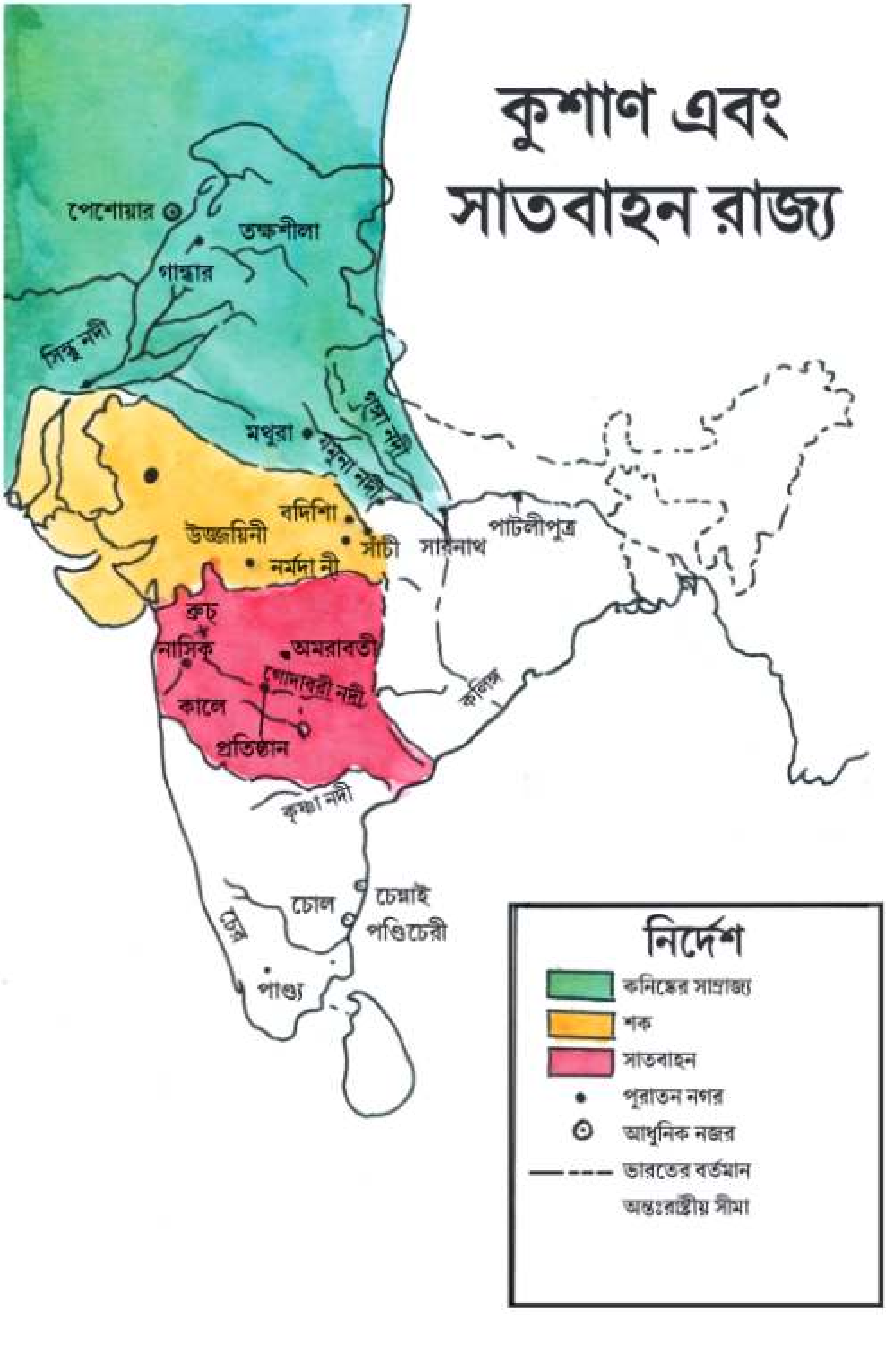

ইউচিরা পশ্চিম এশিয়াতে পালিয়ে এসে শকদের বিতাড়িত করে ব্যাকট্রিয় বা উত্তর আফগানিস্তান দখল করে। এরপর তারা হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে নিম্ন সিন্ধু অববাহিকা ও বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে।

কুশান বংশের রাজা কনিষ্কের সাম্রাজ্য আমদরিয়া থেকে আরম্ভ করে গঙ্গা পর্যন্ত এবং কেন্দ্র এশিয়ার খোরাসান থেকে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এশিয়ার কিছু অঞ্চল, আফগানিস্তানের কিছু অংশ এবং পাকিস্তান ও উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল কুশান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মানচিত্র এঁকে তার মধ্যে কুশান সাম্রাজ্য চিহ্নিত কর।

কুশান বংশের শাসকগণ ভারতে বেশ সফলভাবে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম কাড্‌ফিসেস ও দ্বিতীয় কাড্‌ফিসেস রাজাই প্রধান। এই দু'জন রাজা তাঁদের রাজ্যে অনেক মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। এটিই ভারতে প্রচলিত প্রথম স্বর্ণমুদ্রা। কিছু মুদ্রায় শিব মূর্তি অঙ্কিত হওয়ায় তিনি শিব উপাসক ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

কুশান সম্রাট কনিষ্ক ঃ

কুশান রাজবংশের তৃতীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কনিষ্ক। তিনি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করার জন্য এই বছর থেকে 'শকাব্দ' নামে একটি অব্দ প্রচলিত করেন।

রাজ্যজয় ঃ

কনিষ্ক সিংহাসন আরোহণ করার সময় তাঁর রাজ্য আফগানিস্তান, সিন্ধুপ্রদেশের একটি বৃহৎ অংশ, পঞ্জাব এবং পার্থিয়ার ও ব্যাকট্রিয়র কিছু অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কনিষ্ক খোটানি, কাশ্মীর, গাঙ্গেয় উপত্যকার কিছু অংশ মালব ইত্যাদি জয় করে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে পারস্য (বর্তমান ইরান) থেকে পূর্বে পাটলিপুত্র (বিহারের পাটনা) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার) তাঁর রাজধানী ছিল।

কুশানদের প্রচলিত মুদ্রা

অনেকের মতে অশ্বঘোষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য নানাস্থানে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন ও অনেকগুলি স্তূপ ও বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কনিষ্ক বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মিলনীর আহ্বায়ক ছিলেন। এই সম্মিলনীতে বৌদ্ধ পণ্ডিতরা বৌদ্ধগ্রন্থগুলি গভীরভাবে অধ্যয়ন চিন্তন ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। এগুলি ধর্মপালনের সাক্ষ্য বহন করছে। সেই ব্যাখ্যাগুলি মহাবিভাষা নামে পরিচিত। এছাড়া তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য মধ্য-এশিয়া ও চীনে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। কনিষ্ক অনেক মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। সেই মুদ্রাগুলিতে বিভিন্ন গ্রীক ও ভারতীয় দেব-দেবীর মূর্তি থাকায় তিনি যে অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিলেন তা বোঝা যায়।

কনিষ্ক নিজের সাম্রাজ্যে ব্যবসাবাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা করেছিলেন। চীন ও রোমের সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের দেহাবশেষ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্থানে অনেক স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সভায় অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, চরক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদ্যমান ছিলেন। কনিষ্কের সময় সংস্কৃত ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় গান্ধার শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। মথুরা থেকে কনিষ্কের একটি মস্তকবিহীন মূর্তি পাওয়া গেছে।

কনিষ্কের মস্তকবিহীন মূর্তি

কনিষ্ক ২৩ বর্ষ রাজত্ব করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ তাঁর রাজত্বকাল। তাঁর রাজত্বকালে কুশান সাম্রাজ্যের বহুবিধ উন্নতি হয়। তাঁর পরে তাঁর উত্তরাধিকারীর দুর্বল শাসনের ফলে কুশান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

দাক্ষিণাত্যের শাতবাহন সাম্রাজ্য ঃ

মুদ্রা, শিলালিপি ও মৎস্যপুরাণ থেকে শাতবাহন সাম্রাজ্য বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়। সেখান থেকে আমরা জানতে পারি যে খ্রীঃ পূঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে নর্মদা, তাপ্তি, গোদাবরী ও কৃষ্ণানদী মধ্যবর্তী অঞ্চল শাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সাম্রাজ্য পূর্বের বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমের আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাতবাহন সাম্রাজের রাজধানীর নাম ছিল প্রতিষ্ঠান। অধুনা মহারাষ্ট্রের পৈঠান নামে পরিচিত।

পুরাণে শাতবাহনদের বলা হয়েছে অন্ধ্র। পুরাণ অনুযায়ী শাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিমুক। তিনি শুঙ্গ কাণ্ব শাসনের অবসান ঘটিয়ে এই বংশে র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর ভাই কৃষ্ণ ছিলেন এই বংশের পরবর্তী শাসক তাঁর পরে এই বংশের তৃতীয় রাজা সাতকর্ণী মালব জয় করে দক্ষিণ কর্ণাটক পর্যন্ত তাঁর রাজ্য এই বিজয়ের স্মৃতি স্বরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। কিন্তু শক রাজা সাতকর্ণীকে পরাজিত করে সাতবাহন সাম্রাজ্যের অনেক অঞ্চল নিজের অধীনে নিয়ে এনেছিলেন। সম্রাট সাতকর্ণীর মৃত্যুর পরে রাণীর দুই নাবালক পুত্রের অভিভাবকরূপে রাণীর হাতেই কিছুদিন রাজ্যের শাসনকার্য ভার ন্যস্ত ছিল।

তোমার দেখা যজ্ঞ বিষয়ে লেখো।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে গৌতমী পুত্র শাতকর্ণী বা দ্বিতীয় শাতকর্ণী শাতবাহন বংশের যশ ও খ্যাতি বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি শক, যব ও পহ্লবদের পরাজিত করে শকদের অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলি নিজের অধিকারে এনেছিলেন তার পরে বাশিষ্টির পুত্র পুলমারী ও তাঁর পরে যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণী শাতবাহন বংশের যশ ও খ্যাতি বাড়িয়েছিলেন।

যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণীর সময়েই কিন্তু শাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা। শেষে শক, পহ্লব ও কুশানদের আক্রমণের ফলে শাতবাহন সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়।

সাতবাহন রাজাদের শাসন প্রণালী ঃ

রাজা ছিলেন ক্ষমতার শীর্ষে। সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশ ও প্রদেশগুলি জনপদে বিভক্ত ছিল।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য আমাদের রাজ্যকে কীভাবে ভাগ করা হয়েছে লেখো।

শাতবাহন সাম্রাজ্যের সঙ্গে মধ্য-এশিয়া ও রোম সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বেশি হতো। শাতবাহনরা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিল। রাজা অন্য ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। বণিকরা বৌদ্ধগুম্ফা, চৈত্যগৃহ ও বহু স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। শাতবাহন জাতির লোকেরা সব জাতির লোকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতো। তাঁরা রাজ্যের রাস্তাঘাটের উন্নতি করেছিলেন।

খারবেল ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গ রাজ্যে (বর্তমান ওড়িশা) এক মহান রাজবংশের উত্থান ঘটেছিল। এই রাজবংশ মহামেঘবাহন বংশ নামে পরিচিত। তাদের পূর্বপুরুষরা চেদি ছিল বলে বিশ্বাস। এই রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন মহামেঘবাহন-ঐর খারবেল। তিনি কলিঙ্গকে এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে কলিঙ্গ রাজ্যের গৌরব ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল। তিনি দিগ্‌বিজয়ী বীর, প্রজাবৎসল এবং শিল্প ও সংস্কৃতির প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। তিনি জৈনধর্ম গ্রহণ করলেও অন্য ধর্মের প্রতিও তাঁর সমান অনুরাগ ছিল।

খারবেল মহামেঘবাহন বংশের তৃতীয় রাজা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে শাসনভার গ্রহণ করার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। ভুবনেশ্বরের উদয়গিরি পাহাড়ের হাতিগুম্ফাতে তাঁর তেরো বছর রাজত্বের বিবরণী ক্ষোদিত রয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, খারবেল শৈশবে বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাতেও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৪০ শতকে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খারবেলের রাজত্বকালের বিভিন্ন কার্য ঃ

খারবেলের রাজ্যশাসনের প্রথম বর্ষে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত তাঁর রাজধানী কলিঙ্গ নগরের তোরণ, প্রাচীর ইত্যাদির পুনরায় নির্মাণ করা হয়েছিল। শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নির্মল জলপূর্ণ পুষ্করিণী ও শোভিত উদ্যানের পুনরুদ্ধার করিয়েছিলেন।

খারবেলের রাজ্যজয় ঃ

খারবেলের রাজ্য শাসনের দ্বিতীয় বর্ষ থেকে তাঁর রাজ্য শাসন শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর প্রধান কর্তব্য বলে স্থির করলেন। তিনি পশ্চিম দিকে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে রাষ্ট্রিক ও ভোজকদের পরাস্ত করলেন। উত্তর ভারতে সৈন্য পাঠিয়ে মগধ রাজাকে পরাজিত করেন। এছাড়া আক্রমণকারী যবনদের

মথুরা পর্যন্ত হটিয়ে দিয়েছিলেন। দক্ষিণ দিকে পিথুণ্ড অধিকার করে শক্তিশালী তামিল রাষ্ট্রসংঘ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। মগধে রাজা বৃহস্পতি মিত্রকে পরাজিত করে নন্দরাজা কলিঙ্গ আক্রমণ করে যে কলিঙ্গ জিন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তিনি তা পুনরায় অধিকার করেন। এভাবে বীর পরাক্রমে তিনি রাজ্য বিস্তার করেন।

খারবেলের শাসন ঃ

মৌর্য শাসন কালের কিছু রাজকর্মচারীর পদ খারবেলের সময়েও প্রচলিত ছিল। মৌর্য বংশের রাজত্বকালে মহাপাত্রকে মহামদ বলা হতো। নগর অখদংস এবং কন্ম নামক উচ্চকর্মচারী কর্মবিভাগের দায়িত্বে ছিল।

বর্তমান আমাদের রাজ্যশাসন কার্যে নিযুক্ত কয়েকজন প্রধান কর্মচারীদের নাম সংগ্রহ করে একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

খারবেল একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। প্রজাদের কল্যাণের জন্য তিনি তাঁর রাজকোষ থেকে বহু অর্থ খরচ করতেন। তিনি বহুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে কলিঙ্গ নগরের দুর্গ, অট্টালিকা, উদ্যান ও পুষ্করিণীর উন্নতি সাধন করেছিলেন। নন্দরাজা দ্বারা খনিত কেনাল ব্যবহারযোগ্য করে তিনি কলিঙ্গনগর পর্যন্ত বাড়িয়েছিলেন। ভুবনেশ্বরের নিকটস্থ শিশুপালগড়ে তাঁর রাজধানী কলিঙ্গনগর ছিল বলে অনুমান করা হয়। তাঁর রাজত্বের নবম বর্ষে তিনি মহাবিজয় প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন।

কেনাল দ্বারা লোকেদের কী উপকার হয় লেখো।

খারবেল জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি জৈন ধর্মাবলম্বী হয়েও অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন। বিভিন্ন ধর্মের উপাসনাস্থল সংস্কার সাধন করেছিলেন। ভুবনেশ্বরের উদয়গিরি পাহাড়ে জৈন সন্ন্যাসীদের বাস করার উপযোগী কতকগুলি গুম্ফা তৈরি করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতের সঙ্গম যুগ ঃ

দক্ষিণ ভারতে যে সময় তামিল কবি ও পণ্ডিতবর্গ একত্রিত হয়ে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করেন, সেই সময়কে সঙ্গম যুগ বলা হয়। এই কবিতাগুলি পাণ্ড্য, চোল, চের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশিষ্ট কবি ও পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত হয়। তামিল কবি ও পণ্ডিতদের সভাকে সঙ্গম বলা হতো। তামিলনাড়ুর মদুরাই শহরে এই প্রকার তিনটি সঙ্গম অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সঙ্গম সাহিত্য ঃ

সঙ্গম যুগে তামিল সাহিত্যের বিকাশ হয়। শতাধিক শ্রেষ্ঠ কবিদের দ্বারা সঙ্গমে অনেক কবিতা রচিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেক নারী কবিও ছিলেন। এছাড়া এই যুগে 'তোলকা পিয়ম' নামে একটি তামিল ভাষায় ব্যাকরণ বই রচিত হয়েছিল। সাহিত্যের এই উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি আটভাগে বিভক্ত।

তোমার অঞ্চলের বিশিষ্ট কবি ও লেখকদের নামের তালিকা প্রস্তুত কর।

সঙ্গম যুগকে তামিল সাহিত্যের 'সুবর্ণ যুগ' বলা হয়। সঙ্গম সাহিত্য থেকে তামিল রাজ্যের অধিবাসীদের সংস্কৃতি, পরম্পরা ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। এদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা ও বাণিজ্য ব্যবস্থা অন্যতম।

সামাজিক অবস্থা ঃ

সমাজে ব্রাহ্মণদের চেয়ে অরিভারদের (জ্ঞানী লোক) বেশি সম্মান দেওয়া হত। কৃষকদের ভলাভার বলা হতো। সমাজে শিকারী, মেষপালক ও মৎস্যজীবী জাতীয় লোক বাস করতো। স্ত্রীলোকদের পরিবারের আলোক বলা হতো। ধনী লোকেরা ইটের তৈরি পাকা ঘরে ও গরিব লোকেরা কুঁড়েঘরে বাস করতো।

অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ

তামিল রাজ্যের জমি উর্বর। তারা কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো। চাষবাসের উপর অর্থনীতি নির্ভর করতো। চাষ ব্যতীত ওই রাজ্যের লোকেরা গোপালন, কাপড় বোনা, মাছ ধরা ও বেচাকেনা করে অর্থ উপার্জন করতো। কোনো জিনিস পাওয়ার জন্য অন্য কোনো জিনিস দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। (বস্তু বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল)। তামিল রাজ্যের লোকেরা বিদেশের সঙ্গেও বাণিজ্য-কারবার করত। রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য বিষয়ে প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। সমুদ্রপথে জাহাজে করে বিদেশেও ব্যবসা চালাতো তারা। তামিল রাজ্য থেকে মশলা, গোলমরিচ, রেশম ইত্যাদি জিনিস বাইরের দেশে পাঠানো হতো এবং বাইরে থেকে নিজ রাজ্যে সোনা ও রূপা আমদানী করতো।

অভ্যাস

১. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর ৫০টি শব্দে দাও।**

ক) ব্যাকট্রিয়র শাসক গ্রীকরা ভারত আক্রমণ করেছিল কেন?

খ) শকরা ভারতে কীভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল?

গ) কনিষ্ককে কুশান বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয় কেন?

ঘ) শাতবাহনদের শাসন প্রণালী কেমন ছিল?

ঙ) খারবেলকে দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট ও একজন বিচক্ষণ শাসক বলা হয় কেন?

চ) সঙ্গম যুগে দক্ষিণ ভারতের সামাজিক অবস্থা কীরূপ ছিল?

২. **টীকা লেখ ঃ**

ক) মেনেন্ডর (মিলিন্দ)

খ) রুদ্রদানব

গ) ইউচি

ঘ) দ্বিতীয় কাড্‌ফিসেস্

ঙ) মহাবিভাষা

চ) দ্বিতীয় সাতকর্ণী

৩. নিম্নোক্ত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর একটি কিংবা দুটি বাক্যে লেখো।

ক) ভারতীয় গ্রীক শাসনকর্তা মেনেন্ডরের রাজধানী শাকল-এর বর্তমান নাম কী?

খ) শকরা প্রথমে কোথায় বাস করত?

গ) কোন কোন অঞ্চল কুশান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

ঘ) কনিষ্ক কোন কোন অঞ্চল জয় করে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল?

ঙ) কুশানরা কোন মূল যাযাবর জাতির লোক ছিল?

চ) শাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

ছ) খারবেলের রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল বলে অনুমান করা হয়?

৪. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির চারটি করে সম্ভাব্য উত্তর প্রত্যেক প্রশ্নের নীচে দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে যে উত্তরটি ঠিক তার পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

ক) খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে কে প্রথমে ভারত আক্রমণ করেছিল?

শক কুশান

শাতবাহন গ্রীক

খ) কারা মঙ্গোলীয় মহাশাখার লোক ছিলেন?

শক কুশান

শুঙ্গ শাতবাহন

গ) কে ভারতে সর্বপ্রথম স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন?

রুদ্রদামন কনিষ্ক

প্রথম কাড্‌ফিসেস দ্বিতীয় কাড্‌ফিসেস

ঘ) খারবেল রাজত্বের কোন বছর মহাবিজয়প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন?

সপ্তম পঞ্চম

চতুর্থ নবম

ঙ) কোন যুগকে তামিল সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়?

গুপ্তযুগ বৈদিক যুগ

সঙ্গম যুগ মৌর্যযুগ

চ) বিদেশ থেকে তামিল রাজ্যে কোন জিনিস আমদানী করা হতো ?

সোনা	তামা
পিতল	কাঁসা

৫. শাতবাহন বংশের রাজাদের শাসনকাল ক্রমানুসারে সাজাও।

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী	সিমুক
গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী	কৃষ্ণ
বশিষ্ঠ পুত্র পুলমারী	

৬. 'ক' স্তম্ভের শব্দের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের উপযুক্ত শব্দ বেছে সংযুক্ত কর।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
অরিভার	বৌদ্ধ পণ্ডিত
আমুদরিয়া	যাযাবর
ইউচি	রুদ্রদামন
শক	নদী
নাগার্জুন	পর্বত
নগর অঘদংস	রাজকর্মচারী
	জ্ঞানীলোক

৭. ঠিক উক্তির পাশে টিক (শু) চিহ্ন ও ভুল উক্তির পাশে ক্রশ (ভ) চিহ্ন দাও।

ক) চীনের বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ হওয়ার জন্য গ্রীকরা চীন অভিমুখে অগ্রসর হতে পারেনি।

খ) রুদ্রদামন পালি ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

গ) দ্বিতীয় কাড্‌ফিসেস স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন।

ঘ) সঙ্গম যুগে 'তেলিকাপিয়ম্‌' নামক এক তামিল ব্যাকরণ বই লেখা হয়েছিল।

ঙ) তামিল কবি ও পণ্ডিতদের সভাকে সঙ্গম বলা হতো।

চ) খারবেল রাজকর্মচারীদের বাসস্থানের জন্য ভুবনেশ্বরের উদয়গিরি পাহাড়ে গুম্ফা খোঁড়া হয়েছিল।

তোমার কাজ

ভারতের মানচিত্র অঙ্কন করে কনিষ্ক কোন কোন রাজ্যজয় করেছিলেন (বর্তমান নাম) চিহ্নিত কর।

খ্রীষ্টাব্দ ৩০০ থেকে ৮০০-র মধ্যে ভারত

অবিনাশ 'মহারাজধিরাজ' উপাধি বই পড়ার পরে সে বিষয়ে জানতে চাইল। সেই উপাধির অর্থ কী এবং তা কে এবং কেন ব্যবহার করত জানতে চাওয়ায় তার মামা বুঝিয়ে বলল, "রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও চক্রবর্তী রাজা এই উপাধি গ্রহণ করত। প্রাচীন ভারতে গুপ্তবংশের রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেছিল।" এবার সেই বংশের রাজা এবং তার পরবর্তী সময়ের রাজাদের বিষয়ে জানবো।

কুশানদের রাজত্বের পরে ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয় এবং তা কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু গুপ্তবংশীয় রাজারা এক বিশাল ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই বংশের প্রথম দুজন রাজা শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচ গুপ্ত অধস্তন রাজা ছিলেন এবং তাঁদের উপাধি ছিল মহারাজ। ভারতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ ছিল গুপ্তবংশের রাজত্বকাল। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত বংশের তৃতীয় রাজা। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী তাঁর রাজত্বকাল। তিনি প্রথম দুজন রাজার মতো অধস্তন রাজা না হয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। তাই তাঁর উপাধি ছিল মহারাজাধিরাজ।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (আনুমানিক খ্রীঃ ৩২০-৩৩৫) ঃ

চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের দিন থেকেই গুপ্তাব্দ আরম্ভ হয়। তিনি লিচ্ছবী বংশের রাজকুমারী কুমার দেবীকে বিবাহ করার পর বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। বিহার, বাংলা ও উত্তর ভারতের কিছু অঞ্চল সহ সমগ্র উত্তর ভারতে তিনি তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। তিনিও মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত (খ্রীঃ ৩৩৫-৩৮০) ঃ

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পরে তাঁর সুযোগ্য পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। এলাহাবাদ স্তম্ভ লেখা থেকে তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। কবি হরিষেণ তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। এটি তাঁর রচনা। তিনি তাঁর লিখিত স্তম্ভ লেখায় সমুদ্রগুপ্তের প্রশংসা করেছেন। তিনি গুপ্ত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষই জয় করেছিলেন। স্তম্ভ লেখায় সমুদ্রগুপ্তের কীর্তিগাথা শোভিত হওয়ায় একে প্রশস্তি বলা হয়।

ভারতের মানচিত্রে এলাহাবাদ জায়গাটি চিহ্নিত কর।

অশোকের এক অনুশাসনও এই স্তম্ভে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ভারতের বিভিন্ন রাজা ও রাজাদের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্ক বিষয়ে এই প্রশস্তিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া তিনি যে দিগ্‌বিজয় অর্থাৎ নানাদিকে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ এই প্রশস্তি থেকে পাওয়া যায়।

রাজ্যজয় ঃ

উত্তর ভারতে সমুদ্রগুপ্ত ন'জন রাজাকে পরাজিত করে তাঁদের রাজ্যগুলি নিয়ে নিজের রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন।

তিনি দক্ষিণ ভারতে প্রভাব বিস্তারের জন্য অভিযানে বেরোন এবং বারোজন রাজাকে পরাজিত করেন। কিন্তু তিনি তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পরাজিত রাজারা সমুদ্রগুপ্তর বশ্যতা স্বীকার করে নেন। ফলে সেই রাজ্যগুলিতে গুপ্ত রাজার রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রইল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী সমতট, দাবক, কামরূপ, নেপাল প্রভৃতি রাজ্যের নরপতিরা স্বেচ্ছায় সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। অনুরূপভাবে সীমান্তবর্তী নয়টি জনজাতির প্রধানরা সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁরা সমুদ্রগুপ্তকে কর ও উপহার ইত্যাদি দিতেন ও তাঁর আদেশ পালন করতেন।

শক, কুশান এবং মুরুন্ডদের প্রধান ও সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করলেন। তার ফলে সমুদ্রগুপ্তের রাজনৈতিক প্রভাব ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত করেন। এমনকি সিংহল বা অধুনা শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত তাঁর অধিপত্য বা প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনিভাবে সমুদ্রগুপ্ত তাঁর সাম্রাজ্য সংগঠিত করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করে তিনি নিজেকে সার্বভৌম রাজা বা সম্রাট বলে প্রতিপাদিত করেন।

অধুনা দক্ষিণ ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির তালিকা প্রস্তুত কর।

সমুদ্রগুপ্ত যে কেবলমাত্র রাজ্যজয়ী বীর ছিলেন তা নয়। তাঁর 'কবিরাজ' উপাধি দ্বারা জানা যায় যে তিনি একজন কবি ছিলেন। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তাঁর প্রচলিত এক মুদ্রার এক পার্শ্বে ক্ষোদিত বীণা সদৃশ বাদ্যযন্ত্র দেখে অনুমান করা যায়। যে, তিনি বীণা বাজাতেন। তিনি উদারচেতা সুশাসক ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত বীণা বাজানোর চিত্র

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৫ খ্রীঃ) ঃ

সমুদ্রগুপ্তের পরে তাঁর যোগ্য পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট হন সমুদ্রগুপ্ত তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করেন। তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যের শাক্তিশালী বাকাতক রাজবংশের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার বাকাতকের রাজকুমার রুদ্রদেবের সঙ্গে বিবাহ সম্পাদিত হয়। তিনি পশ্চিম ভারতে শকদের বিরুদ্ধে বিজয় অভিযান চালিয়ে পশ্চিম মালব্য ও সৌরাষ্ট্র অধিকার করেন। এর ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে ভারতের পশ্চিম উপকূলের সংলগ্ন বন্দর গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। এতে তাঁদের নৌ-বাহিনীর বিশেষ সুবিধা হয়। তাঁর সময়ে গুপ্তরাজ্য শক্তি সম্পাদে বিশেষ শক্তিলাভ করে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

ওড়িশার উপকূলে অবস্থিত বন্দরগুলির নাম লেখো। সেগুলি কোন সগরের নিকটবর্তী তা মানচিত্র দেখে লেখো।

চন্দ্রগুপ্ত জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের তাঁর দরবারে স্থান দিয়েছিলেন। প্রবাদ আছে, তাঁর সভায় বরাহমিহির, অমর সিংহ, কালিদাস, ঘটকর্পর, ধন্বন্তরী, ক্ষপণক, শঙ্কু, বররুচি ও বেতালভট্ট—এই নয়জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এঁরা নবরত্ন নামে পরিচিত এবং উক্ত সভাকে নবরত্নের সভা বলা হতো। এই পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের সময় চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারত পর্যটন করেন।

ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণ ঃ

বৌদ্ধধর্মের জন্মস্থল ভারতে হলেও সে ধর্ম ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হয়েছিল। চীন, জাপান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে এই ধর্মের খ্যাতি বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বহু বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে আসতেন। তাঁদের মধ্যে ফা-হিয়েন অন্যতম।

ফা-হিয়েন যখন ভারতে আগমন করেন তখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভারতে রাজত্ব করতেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে যে ভ্রমণ কাহিনী লিখে গেছেন তাতে ভারতের তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ওই গ্রন্থে গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের নাম উল্লেখ করেননি।

ফা-হিয়েনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ভারতীয়রা সে সময় আনন্দে ছিল। তারা যে কোনো জায়গায় অবাধে যাতায়াত করতে পারতো। তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল। রাজ্যে সুশাসনের পরিবেশ ছিল। প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। গুরুতর অপরাধ বা বারংবার বিদ্রোহ করলে অঙ্গছেদ করা হতো। দোষীরা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতো। অসংখ্য গ্রাম ছিল। রাজা চাষিদের কাছ থেকে এক চতুর্থাংশ ফসলের কর আদায় করতেন। তার বিবরণী থেকে জানা যায়, ভারতে অনেক ধর্মশালা ছিল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও ব্রাহ্মণ—উভয় সম্প্রদায়ের লোক একত্রে বাস করতো। তাদের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল না। ভ্রমণ শেষ করে তিনি সমুদ্রপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

জাপান থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এলে ওড়িশার কোন জায়গাগুলি পরিদর্শন করতে চাইবে, ভেবে লেখো।

বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়ে বৌদ্ধধর্ম পরবর্তী সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রসারিত হয়ে শ্রীলঙ্কা, চীন, জাপান মিয়াঁমার ইত্যাদি দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু গুপ্ত রাজত্বকাল থেকে এই ধর্মের ক্রমশ অবনতি হতে শুরু করলো। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান হওয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমতে শুরু করে।

গুপ্ত রাজারা দু'শ বছরের বেশি সময় পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। অবশ্য শেষের দিকে অল্পসংখ্যক কিছু রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

তার ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম জনপ্রিয় হতে শুরু করল। এর সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মগ্রন্থ সব সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ফা-হিয়েনের লিখিত তথ্য থেকে জানা যায় যে পঞ্চম শতাব্দীতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব উত্তর ভারতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব বেশী হওয়ায় বৌদ্ধধর্মের পূর্ব গৌরব পরিপুষ্ট হতে না পেরে হ্রাস পেতে লাগল। গয়া ও কপিলাবস্তুতে অনেক বৌদ্ধ বিহার পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকতে দেখেছেন চীনদেশীয় পরিব্রাজক। দক্ষিণ ভারতে পল্লবরাও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। মহাযান পন্থার অভ্যুদয়ের ফলে বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজার প্রচলন শুরু হল। বৌদ্ধশাস্ত্র সব সংস্কৃত ভাষায় লেখা হল। ফলে বৌদ্ধধর্ম ও বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে যে প্রভেদ তা ক্রমে হ্রাস পেল। এমনকি বুদ্ধ বিষ্ণুর এক অবতারভাবে পরিগণিত হলেন। আচার্য শংকরের প্রচারিত অদ্বৈতবাদের প্রভাব বৌদ্ধধর্মের উপরে পড়ল। তিনি হিন্দুধর্মের সুরক্ষার জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তর্ক সাধ্যাতীত জেনে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা সাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে পারলেন না। সাধারণ লোকে বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে পৃথকভাবে গ্রহণ করতে চাইল না। হিন্দুধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মে তন্ত্র প্রবেশ করায় বজ্রযানের আবির্ভাব হল।

সুতরাং এইসব কারণে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশ ম্লান হয়ে এল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঃ

নিম্নলিখিত কারণে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরায় উন্নতি হয় বলে অনেকের অনুমান। যেমন গুপ্তযুগে বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ প্রসার লাভ। কিছু গুপ্ত রাজা কর্তৃক বিষ্ণুর উপাসনায় আস্থা স্থাপন। সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তা। ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে পূজা-নৈবেদ্য নিবেদন, এছাড়া গুপ্তযুগে ১৮টি পুরাণের সংকলন প্রকাশ। ওই পুরাণগুলিতে বিষ্ণু ও শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা। গুপ্তযুগে বিভিন্ন স্থানে মূর্তিপূজার জন্য মন্দির নির্মাণ ও মূর্তিপূজার প্রচলন। গুপ্তযুগে ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষত্ব যে অবতারবাদ, তার প্রতিষ্ঠা। দুষ্টের দমনের জন্য বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতাররূপে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ—এইসব বিষয় লোকের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

দশ অবতারের নাম সংগ্রহ করে লেখো।

সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য এবং বিজ্ঞান ঃ

সাহিত্য ঃ

গুপ্তযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল। কী ধর্ম এবং কী লৌকিক সাহিত্য—দু'টি বিষয়েই উন্নতি হয়েছিল। গুপ্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা এই উন্নতির কারণ। গুপ্ত যুগের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার ছিলেন কালিদাস। কালিদাস উভয়বিধ রচনাতেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটক বিশ্ববিখ্যাত। তাঁর রচিত অন্য নাটকগুলি হল—'বিক্রমোবশীয়াম' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্র'।

'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত' ও 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর রচিত। এগুলি তাঁর কালজয়ী রচনা।

কালিদাসের মতো প্রাচীন ভারতের আরও কয়েকজন কবি ও নাট্যকারের নাম সংগ্রহ করে তালিকা প্রস্তুত কর।

শূদ্রক বিদিশার রাজা ছিলেন। তিনি 'মৃচ্ছকটিকম্' নামক একখানি সংস্কৃত নাটকের প্রণেতা। সেই সময় নীতিপূর্ণ 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থ রচনা করেন বিষ্ণু শর্মা।

গুপ্তযুগে অমরসিংহ 'অমরকোষ' নামক অভিধান রচনা করেন। গুপ্তযুগে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির সংকলন সম্পূর্ণ হয়। ভগবদ্‌গীতা মহাভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই সব কারণেই গুপ্তযুগকে সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ বলে মনে করা হয়।

শিল্প ও স্থাপত্য ঃ

গুপ্তযুগে শিল্পকলা ও স্থাপত্যবিদ্যার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়েছিল। শিল্পের বিভিন্ন বিভাগ যথা স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

স্থাপত্য ঃ

এই সময়ে অনেক বৌদ্ধ 'চৈত্যগৃহ ও বিহার' নির্মাণ করা হয়েছিল। পাথরে খোদিত অপরূপ স্থাপত্যকীর্তির দৃষ্টান্ত অপরূপা অজন্তাগুহাতে দেখতে পাওয়া যায়।

ওড়িশার কোন কোন স্থানে বৌদ্ধ বিহার রয়েছে নাম সংগ্রহ করে লেখো।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের ফলে গুপ্তযুগে বৌদ্ধমূর্তি অপেক্ষা দেবদেবীর মন্দির নির্মাণের দিকে বেশী ঝোঁক দেখা গেল। উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসী জেলার দেওগড়ে দশাবতার মন্দির মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার তিগোত্ত্বায় বিষ্ণু মন্দির, ভূমার নিকটে শিবমন্দির ও ভিতরগাওঁর ইষ্টক নির্মিত মন্দির গুপ্তযুগে স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন।

ভাস্কর্য ঃ

গুপ্তযুগের ভাস্কর্য শিল্পেও শিল্পী-আত্মার চরম বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। গুপ্ত ভাস্কর্যে কোমলতা, স্বাভাবিকতা, সুন্দরতা, আলংকারিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার সুন্দর সমাবেশ দেখা যায়। গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি মথুরা ও সারনাথে দেখতে পাওয়া যায়। সারনাথের বুদ্ধমূর্তি ভারতীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

সারনাথের বুদ্ধ

মধ্যপ্রদেশের উদয়গিরির বরাহমূর্তি, দেওগড়ের শেষশায়ী বিষ্ণু, অহিছত্রের মাটির মূর্তি ও কোহর মুখলিঙ্গ ইত্যাদি গুপ্ত শিল্পকলার অনবদ্য সৃষ্টি।

তোমার বাড়ির কাছে থাকা মন্দিরের বিষয়ে লেখো।

চিত্রকলা ঃ

গুপ্তযুগে চিত্রশিল্পও প্রসার লাভ করেছিল। মহারাষ্ট্রে অজন্তার ভিত্তিচিত্র চিত্রকলার এক জীবন্ত উদাহরণ। অজন্তা গুহার চিত্র তো পৃথিবীখ্যাত শিল্প নিদর্শন।

মেহেরাউলির লোহার স্তম্ভ

বিজ্ঞান ঃ

গুপ্তযুগে কেবল সাহিত্য ও কলার উন্নতি ঘটেনি, বিজ্ঞান ক্ষেত্রেও যথেষ্ট বিকাশ সাধিত হয়েছিল। গণিতের ক্ষেত্রে দশমিক পদ্ধতি, শূন্যের প্রচলন ইত্যাদি গুপ্তযুগের অবদান। ভারতের অঙ্ক লিখন পদ্ধতি আরব দেশে জনপ্রিয় হয়েছিল। এই পদ্ধতি ইউরোপেও প্রসারিত হয়েছিল। প্রখ্যাত গণিত বিশারদ আর্যভট্ট ''আর্যভট্টীয়ম্'' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর গাণিতিক পদ্ধতি দশমিকের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি গণিতকে এক স্বতন্ত্র বিষয়রূপে পরিগণিত করেছিলেন। তাঁর মতে পৃথিবী একটি গ্রহ ও তা নিজকক্ষে ঘুরছে।

সে যুগের আর একজন প্রসদ্ধি জ্যোতির্বিজ্ঞানী হলেন বরাহমিহির। তিনি ''বৃহৎসংহিতা'' রচনা করেন। তিনি সিদ্ধান্তকারে রোমক সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন এতে গ্রীক প্রভাবের কথা অনুমান করা হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদ 'বাণভট্ট' গুপ্ত যুগে ছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস।

ওড়িশার একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম লেখ ও তাঁর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ কর।

গুপ্তযুগের ধাতু শিল্পেও উন্নতি হয়েছিল। গুপ্তযুগের শিল্পীরা সুন্দর সুন্দর লোহা ও কাঁসার মূর্তি নির্মাণ করতেন। দিল্লীর মেহেরাউলিতে যে লোহার স্তম্ভ আছে তা গুপ্তযুগের কীর্তি। আশ্চর্যের কথা, সে লোহার স্তম্ভে আজ পর্যন্ত কোথাও জং ধরেনি। এর থেকে জানা যায় যে গুপ্তযুগের ধাতুশিল্প এত উন্নত ও সুন্দর ছিল যে ভাবা যায় না। নালান্দা থেকে এক বিশাল তাম্রনির্মিত বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। আজও পর্যন্ত তার উজ্জ্বল ও মধুর ভাব অম্লান রয়েছে। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে গুপ্তযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিল্পের দিক দিয়েও এক সুবর্ণযুগ।

পল্লব বংশ, চালুক্য বংশ, বর্ধন বংশ এবং জুয়াং-জাং এর ভারত ভ্রমণ ঃ

পল্লব বংশ ঃ

পল্লব বংশ এক প্রাচীন রাজবংশ। পল্লবরা তামিলনাড়ুর কাঞ্চি অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। চালুক্যদের পূর্বেই তারা দক্ষিণ ভারতে এক শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। শাতবাহন বংশের পতনের পরে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে পল্লব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কাল। এই বংশের প্রথম রাজা সিংহবিষ্ণু শত্রুদের পরাজিত করে কৃষ্ণানদী থেকে কাবেরী নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিল।

প্রথম মহেন্দ্র বর্মন (খ্রীঃ অঃ ৬০০-৬৩০)

পল্লব বংশের প্রথম পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন প্রথম মহেন্দ্র বর্মন। তাঁর রাজত্বকালে পল্লব ও চালুক্যদের মধ্যে শত্রুতা আরম্ভ হয়। একশো বছরেরও বেশী সময় পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। চালক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীন্ ও মহেন্দ্র বর্মনের সঙ্গেও প্রায় যুদ্ধ হতো। মহেন্দ্র বর্মন একাধারে যোদ্ধা, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

প্রথম নরসিংহ বর্মন (খ্রীঃ অঃ ৬৩০-৬৬৮)

পল্লব বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজারূপে নরসিংহ বর্মন সুপরিচিত। তাঁর সময়ে পল্লবদের রাজনৈতিক শক্তি শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীন্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করে চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধিকার করেন। সেজন্য তাঁকে 'বাতাপিকোণ্ডা' নামে অভিহিত করা হয়। যার অর্থ 'বাতাপির বিজয়ী'। পুলকেশীন্ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। তিনি চের ও চোলদেরও যুদ্ধে পরাজিত করেন। নরসিংহ বর্মন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নৌসেনা পাঠিয়েছিলেন। সে কাজেও তিনি সফল হন। নবম শতাব্দীর শেষের দিকে চোলরা পল্লব রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

সংস্কৃতির বিকাশ ঃ

দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পল্লবদের অবদান অতুলনীয়। ওই সময় সংস্কৃত ভাষার খুব সমাদর ছিল। তাঁদের বহু শিলালেখ সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছে। ভারবি ও দণ্ডির মত পণ্ডিত পল্লব রাজদরবারে ছিলেন। ভারবির ''কিরাতা-জুনীয়ম্'' এবং ''দশকুমার চরিতম্'' সংস্কৃত ভাষায় দুটি সুবিদিত গ্রন্থ। কাঞ্চি সংস্কৃতি ও শিক্ষার এক শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। রাজা প্রথম মহেন্দ্র বর্মনের রচিত ''মত্তবিলাস প্রহসন'' একটি সামাজিক নাটক। ধর্মক্ষেত্রে ভক্তি আন্দোলন বৈষ্ণব ও শৈব সন্ন্যাসীদের দ্বারা প্রথমে পল্লব রাজ্যে আরম্ভ হয়েছিল। এই সময় দক্ষিণ ভারতে আর্য সংস্কৃতির প্রসার সম্পূর্ণ হয়। কাঞ্চি বিশ্ববিদ্যালয় আর্য সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্র ছিল। পল্লব রাজারা সব ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। চীনদেশীয় পবিব্রাজক জুয়াং-জাং পল্লব রাজ্য ভ্রমণ করে তাঁর বিবরণীতে কাঞ্চিপুরম সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন।

পল্লবদের রাজত্বকালে কলা ও স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। শিব ও বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। মহাবলীপুরমে পাথর কেটে কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। সেগুলিকে রথ বলা হয়। মহাবলীপুরমের পাণ্ডব রথ ও সমুদ্রতটের নির্মিত মন্দির পল্লব রাজত্বকালের সময়ে নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে বিখ্যাত। এছাড়া কাঞ্চিপুরমের কৈলাসনাথ মন্দির পল্লবদের সুখ্যাতিজনক কার্য।

তোমার দেখা ওড়িশার মন্দিরগুলি পাথর কেটে না পাথর জোড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে, আলোচনা করে লেখো।

চালুক্য বংশ ঃ

বিন্ধ্য পর্বতমালা থেকে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত অঞ্চলকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়। এই অঞ্চলে শাতবাহনদের পতনের পরে বাকাতক জাতি এক শক্তিশালী রাষ্ট্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে উদ্যম শুরু করে; কিন্তু তারা বেশিদিন পর্যন্ত শাসন করতে পারেনি। তারপরে চালুক্যরা দাক্ষিণাত্যে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র নির্মাণ করতে সফল হয়। মুখ্যত কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মাঝখানের উর্বর অঞ্চল রাইচুরে চালুক্যরা নিজের আধিপত্য বিস্তার করার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করত।

দ্বিতীয় পুলকেশীন্ (খ্রীঃ অঃ ৬০৮-৬৪২)

চালুক্য রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় পুলকেশীন্ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। জৈন কবি রবিকীর্তিক কর্তৃক রচিত অহিহোল শিলালেখ থেকে পুলকেশীনের রাজত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। হষবর্ধন দক্ষিণ ভারত অভিযানে আসার সময় নর্মদা নদীকূলে পুলকেশীনের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। হর্ষবর্ধনকে পরাস্ত করে চালুক্য রাজা পুলকেশীন্ দক্ষিণা পথ স্বামী উপাধিতে ভূষিত হন। পল্লব রাজা প্রথম মহেন্দ্র বর্মনও তাঁর কাছে পরাজিত হন। তাঁর সময়ে চালুক্য রাজ্যের সীমা পশ্চিমে আরব সাগর ও দক্ষিণে অধুনা কর্ণাটক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কিন্তু এই সফলতা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। পল্লব মহেন্দ্র বর্মনের পরে প্রথম নরসিংহ বর্মন পুলকেশীন্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করে। চালুক্য রাজধানী বাতাপি পল্লবরা অধিকার করেছিল। কিছু কাল পরে প্রথম বিক্রমাদিত্য চালুক্য রাজার পূর্ব গৌরব পুনর্বার ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং রাজধানী বাতাপি পুনরায় অধিকার করেছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে চালুক্য রাজার পতন হয়। চালুক্য রাজার রাজধানী বাতাপি বা বাদামি বর্তমান কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত।

সংস্কৃতির বিকাশ ঃ

রাজধানী বাতাপি তখন এক সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ ধরেই চালুক্য রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছিল। ইরান, আরব দেশ এবং লোহিত সাগরস্থিত বিভিন্ন বন্দরে চালুক্য বণিকেরা

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যেত। দ্বিতীয় পুলকেশীন্ পারস্য রাজা দ্বিতীয় খুস্রুর কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। জুয়াং-জাং-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে তিনি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন।

চালুক্য রাজ্যে পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণ করা হতো। বাতাপি বা বাদামির বিভিন্ন মন্দিরে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের কমনীয় মূর্তি পাওয়া যায়। সেই সময় অজন্তা চৈত্যগৃহগুলি পাহাড়ে খোদিত ছিল। ইলোরা, মেগুতি, অহিহোল এবং পট্টদকলের মন্দির চালুক্যের রাজত্বকালের স্থাপত্য-কীর্তি।

বর্ধন বংশ ঃ

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়। ভয়ংকর স্বভাব বিশিষ্ট হুনজাতির আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। উত্তর ভারতে অনেক ছোট ছোট রাজ্যের আবির্ভাব হয়। রাজনৈতিক একতা ও শক্তিশালী শাসনের ঘোর অভাব দেখা গেল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে উত্তর ভারতে দুটি প্রধান রাজবংশের উত্থান হয়, যথা— থানেশ্বরের বর্ধন বংশ এবং কনৌজের মৌখারী বংশ।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমেই প্রভাকর বর্ধন 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করে থানেশ্বরে এক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন তাঁর দুই পুত্র এবং একমাত্র কন্যা রাজ্যশ্রী মৌখারী রাজকুমার গ্রহবর্মনকে বিবাহ করে। পিতার মৃত্যুর পরে রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হন।

এই সময় মালবের রাজা দেবগুপ্ত গ্রহবর্মনকে হত্যা করেন। দেবগুপ্ত গৌড় বা বাংলার রাজা শশাঙ্কের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। ভগ্নীপতির হত্যাকারীকে যুদ্ধে পরাজিত করে প্রত্যাবর্তনের সময় শশাঙ্কের ষড়যন্ত্রের ফলে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হয়। রাজ্যশ্রী বিন্ধ্য পর্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই দুদিনের মধ্যে মাত্র ষোলো বছর বয়সে হর্ষবর্ধনের রাজ্যাভিষেক হয়।

হর্ষবর্ধন (রাজত্বকাল ৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ)

জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর ৬০৬ খ্রীঃ হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় থেকেই হর্ষাব্দ আরম্ভ হয়। মহারাজ হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের রচিত 'হর্ষচরিত' থেকে আমরা তাঁর বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারি। কিন্তু এটি হর্ষবর্ধনের সম্পূর্ণ জীবনী গ্রন্থ নয়।

কোনো লোকের জীবনী পড়লে আমরা কী জানতে পারি, ভেবে লেখো।

গ্রহবর্মনের মৃত্যুর পরে কনৌজে আর কেউ রাজা রইলেন না। রাজ্যশ্রী শাসনভার বহন করতে রাজি না হওয়ায় কনৌজের রাজা হওয়ার জন্য হর্ষবর্ধনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। হর্ষবর্ধন মৌখারী রাজ্যের রাজা হওয়ায় থানেশ্বর ও কনৌজ রাজ্য একসঙ্গে মিশে যায়। সুষ্ঠভাবে রাজ্য শাসনের জন্য হর্ষবর্ধন তাঁর রাজধানী থানেশ্বর থেকে কনৌজে স্থানান্তরিত করেন। তারপর তিনি বর্ধন বংশের প্রধান শত্রু গৌড়রাজা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যুদ্ধ অভিযান করেন। ইতিমধ্যে শশাঙ্কের

বিরুদ্ধে নিজের আধিপত্য সুদৃঢ় করার জন্য কামরূপের (আসাম) রাজা ভাস্কর বর্মনের সঙ্গে সন্ধি করেন। শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন কি না সে বিষয়ে কিছু সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না তবে এটুকু জানা গেছে যে শশাঙ্কের মৃত্যু পরে (৬৮৮ খ্রীঃ) হর্ষবর্ধন তাঁর রাজ্য অধিকার করেন।

হর্ষবর্ধন নিজের জামাতা ধ্রুবসেনকে বল্লবী রাজ্য সিংহাসনে বসান। এর ফলে বল্লবীতে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দাক্ষিণাত্য অভিযানের সময় হর্ষবর্ধন চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীনের কাছে পরাজিত হয়ে রাজ্যে ফিরে আসেন।

হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। এজন্য তাঁকে 'সকলোত্তর পথনাথ' বলা হতো। চল্লিশ বছর রাজত্ব করার পরে হর্ষবর্ধন ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

শাসন ও সভ্যতা ঃ

হর্ষবর্ধন গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করে নিজের সাম্রাজ্য প্রচলন করেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। তাঁর শাসন প্রণালী ছিল অসাধারণ। শাসনকার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য ওই কার্যে অনেক কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। অশোকের মতো তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন ও তার প্রতিকার করতেন। উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ কর তিনি আদায় করতেন। রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর আইন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিলেন। গুরুতর অপরাধের জন্য অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদনের ব্যবস্থা করা হতো।

ধর্ম ঃ

হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের উপরেই হর্ষবর্ধনের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিজে সূর্য, শিব ও বুদ্ধের উপাসনা করতেন। জীবনের শেষ বেলায় তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। চীনা পরিব্রাজক জুয়াং-জাংকে সম্মান দেওয়ার জন্য তিনি রাজধানী কনৌজে এক বিরাট ধর্মসভার আয়োজন করেন। হর্ষবর্ধন প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগে (এলাহাবাদ) ধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করতেন। সেই উৎসবে রাজ্যের সঞ্চিত ধন লোকেদের দান করতেন। তাঁর সময়ে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। তাঁর সময়েই চৈনিক পরিব্রাজক ইউ-য়ান-চুয়াং ভারতবর্ষে আসেন।

হর্ষবর্ধন সাহিত্য-চর্চা করতেন। নাগানন্দ, রত্নাবলী এবং প্রিয়দর্শিকা-সংস্কৃত নাটকগুলি কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন লিখেছেন বলে অনেকে মনে করেন। প্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট মহারাজ হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন। তাঁর প্রণীত 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' প্রসিদ্ধ।

জুয়াং-জুং-এর (হিউয়েন সাং) ভারত ভ্রমণ ঃ

ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ এবং বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (জুয়াং জাং) ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থলপথে ভারতবর্ষে আসেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে 'সি-ইউ-কি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ওড়িশা এসে পুষ্পগিরি বৌদ্ধবিহার এবং চেলিতালো বন্দর দর্শন করেন। তিনি কনৌজে হর্ষবর্ধনের বন্ধুভাবে কিছুদিন অবস্থান করেন। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অপেক্ষাকৃত অনেক বিশ্বাসযোগ্য বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। তিনি যে ভ্রমণকাহিনী লিখে গেছেন তাতে ভারতবর্ষের তখনকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্ম এবং শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তার বিবরণ থেকে জানতে পারি যে কনৌজ এক সমৃদ্ধিশালী নগর হলেও পাটলীপুত্র ও বৈশালী নগরের গৌরব হ্রাস পায়।

জুয়াং-জুং

হিউয়েন সাঙের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ওই সময়ে লোকেদের জীবন সরল ও পবিত্র স্বভাব ছিল। অধিকাংশ লোক নিরামিষাশী ছিল। কঠোর জাতিপ্রথা ছিল। শূদ্রদের কৃষক জাতির লোক বলা হতো। তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বিবরণে রয়েছে বৌদ্ধধর্মের নাকি আঠারোটি শাখা। এদের মধ্যে মহাযান ও হীনযান শাখা হল প্রধান। অনেক পুরাতন বৌদ্ধ কেন্দ্র তাঁর ভ্রমণের সময় ভেঙে গিয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে নালন্দার খ্যাতি বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। নানা দূর দেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিতরাই প্রসিদ্ধ ধর্মপীঠে আসতেন ধর্মচর্চা, ধর্মালাপ ও ধর্মশিক্ষা অধ্যয়নের জন্য। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বৌদ্ধদের একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। তিনি জানিয়েছেন, দেশ বিদেশের দশ হাজার বিদ্যার্থী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করত। সেখানে মহাযান শাখার বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। তিনি হর্ষবর্ধনকে জনহিতৈষী শাসক বলে প্রশংসা করেছেন। হর্ষবর্ধন দ্বারা আয়োজিত কনৌজ সভা এবং প্রয়াগ ধর্মসভার সবিশেষ বিবরণ দিয়েছেন তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে। তিনি ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় এবং আরবদের সিন্ধু অঞ্চল অধিকার ঃ

পৃথিবীতে যে সব ধর্মের অভ্যুত্থান হয়েছে, তাদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম অন্যতম। অন্ধবিশ্বাস দূর করার জন্য যে সব উপায় দেখানো হয়েছে, তাদের মধ্যে ইসলাম হল সবচেয়ে সরল ও বোধগম্য। ঐক্যভাব, উদারতা, ভ্রাতৃপ্রেম, পবিত্রতা ও সত্য—এই ধর্মের মূলমন্ত্র।

উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধন, দক্ষিণ ভারতে পল্লব রাজা নরসিংহ বর্মন ও চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীন্—এঁদের শাসনকালে সুদূর আরব মরুভূমিতে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে এক নূতন ধর্ম প্রচারিত হয়। মহাপুরুষ মহম্মদ ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক।

ইসলাম ধর্ম ব্যতীত ভারতের বাইরে সৃষ্ট আর কয়েকটি ধর্ম বিষয়ে জানতে চেষ্টা কর।

এই ধর্ম অভ্যুত্থানের পূর্বে সমাজে নানাপ্রকার কুসংস্কার দেখা দিয়েছিল। আরবের অধিবাসীরা মূর্তিপূজা করত। মক্কার 'কাবা' নামক পাথরকে তারা পূজা করত। ধনী সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যন্ত বেশি হারে সুদ নিয়ে লোকেদের শোষণ করত বেশী পরিমাণে মাদক দ্রব্যের চাহিদা ছিল।

হজরত মহম্মদ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরবদেশের মক্কানগরে জন্মগ্রহণ করেন। কুসংস্কারের শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তির কথা সর্বদা ভাবতেন। তিনি হীরা নামক পর্বতে ধ্যানস্থ অবস্থায় ভগবান আল্লার প্রেরিত দূত গাব্রিয়েলের বাণী তিনি শুনতে পেতেন। এই নতুন ধর্মের সারাংশ হল—ভগবান এক ও অদ্বিতীয়। আল্লা হচ্ছেন ভগবান ও মহম্মদ তাঁর প্রতিনিধি। যাঁরা তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করলেন, তাঁদের বলা হয় মুসলমান।

ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থের নাম 'কোরান'। অল্লার মুখনিঃসৃত বাণী। মহম্মদের ধর্ম প্রচারে বেশী গুরুত্ব পেত একেশ্বরবাদ।

আরবীয় বণিকদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ ও খ্রীষ্টাব্দ ২০০র মধ্যে ভারতের সঙ্গে এশিয়ার পশ্চিম ও কেন্দ্রাঞ্চলের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশের বণিকেরা রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে রীতিমত ব্যবসা বাণিজ্য করত। এদের মধ্যে অনেকে কেরলের উপকূলবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখত। ওই অঞ্চল থেকে ভারতীয় মশলা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী ক্রয় করে বিভিন্ন দেশের বাজারে বিক্রি করতএবং নিজের দেশেও নিয়ে যেত। এভাবেই ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের আগেই আরবের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যগত সম্পর্ক আরম্ভ হয়েছিল। তারপরে নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আরবের বণিকেরা ভারতে ধর্ম প্রচারের জন্য এসে কিছু ভারতবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। কালক্রমে কেরলে এক মুসলমান সম্প্রদায় সৃষ্টি হল। এদের 'মোপলা' মুসলমান বলা হয়। আরবের ব্যবসায়ীবৃন্দ তাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য মেলার আয়োজন করেছিল। ভারত ও ভারতের বাইরে থেকে অনেক দ্রব্যসামগ্রী আনা হতো ওই মেলায় বিক্রির জন্য।

আরবীয়দের সিন্ধু অঞ্চল অধিকার ঃ

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী বা খলিফারা রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে আরব সৈন্যেরা সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, প্যালেস্টাইন, ইজিপ্ট, আফ্রিকার পূর্বাঞ্চল ও ইউরোপের স্পেন ইত্যাদি স্থানে ধর্ম প্রচারের সঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে অষ্টম শতাব্দীতে খলিফারা ভারত আক্রমণ করল। ভারতের ধনরত্নে তারা প্রলুব্ধ হল। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা তাদের ভারত আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু দুবার ভারত আক্রমণ করেও তারা সফল হতে পারেনি।

শেষে ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে খলিফার আদেশে মহম্মদ বিন কাশিম নামক এক আক্রমণকারী বহুসংখ্যাক সৈন্য সংগ্রহ করে সিন্ধুপ্রদেশে প্রবেশ করেছিলেন। স্থানীয় রাজার প্রতি প্রজাদের অসন্তোষ এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কারণে মহম্মদ বিন কাশিম অতি সহজে সিন্ধু ও পঞ্জাবের কিছু অঞ্চল অধিকার করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও খলিফার আদেশে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং আরবরা ভারতে ইসলাম রাষ্ট্র নির্মাণ করতে পারেনি। কিন্তু বোধবুদ্ধির ক্ষেত্রে আরবীয়গণ ভারতের কাছে দর্শন, গণিতবিদ্যা, আয়ুর্বেদ, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেছিল।

অভ্যাস

১. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

ক) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে কোন উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং তিনি কীভাবে তাঁর রাজ্যকে বিস্তৃত করেছিলেন।

খ) ফাহিয়েনের ভারত ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে সেই সময়ের লোকেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কীরূপ ছিল উল্লেখ কর।

গ) গুপ্তযুগে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও ব্রহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান কীভাবে হয়েছিল?

ঘ) গুপ্তযুগের রাজাদের সময়ে সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যর কীভাবে উন্নতি হয়েছিল লেখো।

ঙ) ভারতীয় সংস্কৃতিতে চালুক্যদের অবদান বিষয়ে উল্লেখ কর।

চ) দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পল্লব রাজবংশীয় শাসকদের অতুলনীয় দানের কথা উল্লেখ কর।

ছ) জুয়াং-জাং (হিউয়েন সাং) কে? তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে কী লিখেছেন?

জ) হর্ষবর্ধনের রাজ্যশাসন প্রণালী কেমন ছিল?

ঝ) সমুদ্রগুপ্ত কীভাবে নিজের রাজ্য সুসংগঠিত করেছিলেন ?

ঞ) গুপ্তযুগকে ভারতের সুবর্ণযুগ বলা হয় কেন ?

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লেখো। (তিনটি করে বাক্যে)

ক) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কোন বংশের রাজকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন ? এবং এর ফলে তাঁর প্রভাব কীভাবে বৃদ্ধি ঘটেছিল ?

খ) এলাহাবাদ স্তম্ভলেখর রচয়িতা কে ? একে প্রশস্তি বলার কারণ কী ?

গ) সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল, তা কীভাবে জানা যায় ?

ঘ) ফা-সিয়াং-এর ভ্রমণ বিবরণীতে গুপ্ত যুগের দোষীদের কীভাবে দণ্ড দেওয়া হতো বলে জানা যায় ?

ঙ) প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার কালিদাস কী কী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ?

চ) গুপ্তযুগে কীভাবে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল ?

ছ) হজরত মহম্মদ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কী বলেছিলেন ?

জ) খলিফারা ভারত আক্রমণ করেছিল কেন ?

ঝ) ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের সঙ্গে আরবীয় বণিকদের কেমন বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল ?

৩. নিম্নে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর এক একটি বাক্যে লেখো।

ক) প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পূর্বে রাজত্ব করতেন এমন দুজন গুপ্তবংশের রাজার নাম লেখো।

খ) গুপ্তবংশের তৃতীয় রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কোন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন ?

গ) কোন বছর থেকে ভারতে গুপ্তাব্দ আরম্ভ হয় ?

ঘ) সমুদ্রগুপ্ত কোন যজ্ঞ সমাপন করে নিজেকে সার্বভৌম রাজা বা সম্রাট বলে প্রতিপাদিত করেছিলেন ?

ঙ) গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত চাষীদের কাছ থেকে কীভাবে কর গ্রহণ করতেন ?

চ) শংকরাচার্য দ্বারা প্রচারিত অদ্বৈতবাদের প্রভাব কোন ধর্মের উপরে পড়েছিল ?

ছ) ‘পঞ্চতন্ত্র’ কে রচনা করেছিলেন ?

জ) কোন গুপ্তরাজার দরবারে কালিদাস ছিলেন ?

ঝ) কোন পল্লব রাজা ‘বাতাপিকোণ্ডা’ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ?

ঞ) হর্ষবর্ধনের পিতার নাম কী ?

ট) হর্ষবর্ধনের লিখিত নাটকগুলির নাম লেখো।

ঠ) হজরত মহম্মদ কোন সালে জন্মগ্রহণ করেন ?

ঢ) ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থের নাম কী ?

৪. 'ক' স্তম্ভের শব্দকে নিয়ে 'খ' স্তম্ভের উপযুক্ত শব্দের সঙ্গে দাগ টেনে জুড়ে দাও।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
মহম্মদ	কাদম্বরী
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	কাঞ্চি
বাণভট্ট	ভারতীয় মশলা
পল্লব	অদ্বৈতবাদ
দ্বিতীয় পুলকেশীন্	অহিহোল শিলালেখ
জুয়াং জাং	সি-ইউ-কি
আরব বণিক	সিন্ধু আক্রমণ
মহম্মদ-বিন-কাশিম	একেশ্বরবাদ
শংকর	গুপ্তাব্দ
	মোপলা

৫. বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতে ———— পরাজিত করেছিলেন।
(শক, হুন, গ্রীক, কুশান)

খ) শশাঙ্ক ———— দেশের রাজা ছিলেন।
(গৌড়, বিহার, ওড়িশা)

গ) রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি ———— যুগে সংকলন সম্পূর্ণ করা হয়।
(মৌর্য, নন্দ, গুপ্ত, বৈদিক)

ঘ) প্রভাকর বর্ধন ———— উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।
(বাতাপিকোণ্ডা, মহারাজাধিরাজ, কবিরাজ, গজরাজ)

ঙ) জুয়াং-জাং ———— খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।
(৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে, ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, ৪৭০ খ্রীষ্টাে, ৭১০ খ্রীষ্টাব্দে)

চ) দ্বিতীয় পুলকেশীন্ — বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন।

(গুপ্ত, পল্লব, চালুক্য, বর্ধন)

ছ) হর্ষবর্ধন প্রত্যেক পাঁচ বছরে — নিকটে এক ধর্ম উৎসব পালন করতেন।

(কনৌজ, প্রয়াগ, থানেশ্বর, ইলোরা)

জ) 'সকলোত্তর পথনাথ' —কে বলা হতো।

(সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন, শশাঙ্ক)

তোমার কাজ ঃ

কালিদাসের মতো প্রাচীন ভারতের আর কয়েকজন কবি ও নাট্যকারের নাম সংগ্রহ করে তালিকা প্রস্তুত কর।

রাজনীতি বিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

আমরা ও আমাদের সমাজ

খবর কাগজ পড়তে পড়তে বাবা মাকে বললেন গত বন্যায় না জানি কত ধনজীবন নষ্ট হয়েছে। লোকের ঘরদোর ভেসে গেছে, একমুঠো খেতেও পায়নি। সরকারী, বেসরকারী সংস্থা সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ডে দান করবার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছে। আমি আজ কিছু টাকা মানিঅর্ডার করে দিচ্ছি। মা বললেন, "নিশ্চয় এ তো আমাদের কর্তব্য। আমরা সমাজে বাস করি। পরস্পরের সুখ-দুঃখে ভাগীদার হওয়া উচিত। প্রত্যেক লোক, প্রত্যেক পরিবার সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকলে না তবেই আমাদের সমাজ তথা আমাদের দেশের উন্নতি হবে।" পড়ার ঘরে বসে মিনি বাবা-মার কথাবার্তা শুনছিল। ভাবছিল পরিবার, সমাজ—এ-সব আবার কী? এদের মধ্যে সম্পর্কই বা কী? এ-সব না থাকলে আমাদের কী অসুবিধা হতো?

এসো, আমরা এসব বিষয়ে জানবো ঃ

পরিবার ঃ

আমরা সবাই পরিবারে রয়েছি। এটি হল সবচেয়ে ছোট সামাজিক অনুষ্ঠান। পরিবারের সব লোক একটি বাড়িতে বাস করে। কেউ কেউ বাইরে থাকলেও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে।

বাবা, মা ও তাদের সন্তানকে নিয়ে গঠিত পরিবারকে একক পরিবার বলে। আবার কিছু পরিবারে বাবা, মা, জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা, কাকা, কাকিমা, অবিবাহিত দাদা ও পিসি, ঠাকুরদা, ঠাকুমা ইত্যাদি মিলেমিশে বাস করে। এই পরিবারকে যৌথ পরিবার বলে।

তুমি জানো কি?

একক পরিবার ঃ

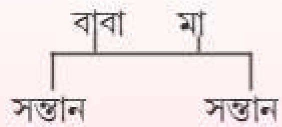

যৌথ পরিবার ঃ

- ভারতীয় পরিবারগুলিতে বাবা-ই মুখ্য
- আবার কিছু পরিবারে মা-ই মুখ্য

বংশ রক্ষা করা পরিবারের প্রধান কাজ। এছাড়া শিশুর লালন পালন করা শিশুদের নানা প্রকার নীতিশিক্ষা দেওয়া, সে বড় হওয়ার পরে জীবিকা অর্জনে তাকে সাহায্য করা ইত্যাদি পরিবারের কাজের মধ্যেই পড়ে। পরিবারের লোকদের কাছে সদগুণ শিক্ষা পেয়ে শিশু সুশিক্ষিত মানুষ হয়।

পরিবারের শিশু কী কী ভালো গুণ শিক্ষা লাভ করে, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো। যেমন মিলেমিশে কাজ করা।

বংশ ঃ

তুমি পুরাণ থেকে যদু বংশ, কুরু বংশ প্রভৃতি বিষয়ে শুনেছ তেমনি ইতিহাসে মৌর্য বংশ, পল্লব বংশ, চালুক্য বংশ ও গুপ্ত বংশ ইত্যাদি বিষয় পড়েছ। সাধারণত কয়েক পুরুষ রক্ত সম্পর্কীয়দের নিয়ে বংশ গঠিত। তোমার বাবা, জ্যাঠামশাই, কাকার পরিবার তোমার ঠাকুরদার পরিবার থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তোমার ঠাকুরদা ও তাঁর ভাইদের পরিবার তাদের বাবার রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। তোমরা সবাই একই বংশ।

একই বংশের লোকেরা পরস্পরের মধ্যে সাহায্য ও দেওয়া নেওয়া করে। বংশপরম্পরা অনুসারে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কর্ম পালন করে। বংশের সদস্যদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হলে বংশের মুরুব্বী ও স্থানীয় লোকেরা এর সমাধান করে দেয়। পুরুষানুক্রমে এক সঙ্গে বসবাস করলে এর লোকসংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। ফলে বংশানুক্রমিক কর্মানুষ্ঠানে অসুবিধা দেখা দেয়। অনেক সময় বিষয়-সম্পত্তি নিয়েও তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এই রকম পরিস্থিতিতে কিছু নিকট আত্মীয়স্বজন পরিবারের মূল বংশধারা থেকে পৃথক হয়ে অন্যত্র বাস করে। একে বংশ বিভাজন বলে। কিন্তু বংশ বিভাজন হলেও সমগ্র বংশের পূর্বপুরুষ অবিচ্ছিন্ন বা একই থাকে। প্রত্যেক বংশের গোত্র বিভিন্ন প্রকার। গোত্র অর্থাৎ কুল প্রবর্তক ঋষি। বিভিন্ন ঋষিকে নিয়ে বিভিন্ন বংশ। যে ঋষিকে নিজের ভেবে সম্মান দেওয়া হয়, সে বংশের গোত্র সেই ঋষি। যথা— কাশ্যপ, ভরদ্বাজ ও নাগস্য।

তুমি কি জান?

- হিন্দুদের বংশ সাধারণত পিতৃবংশীয়।
- একটি মেয়ে যে পরিবারে বিবাহ করে, সে তার স্বামীর বংশের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- অন্য বংশের পোষ্য সন্তান যে পরিবারে এসে বড় হয়, সে সেই পরিবারের বংশের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- প্রত্যেক বংশের গোত্র থাকে।
- কয়েকটি গোত্র হচ্ছে—কাশ্যপ, ভরদ্বাজ ও নাগস্য
- বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে অন্য গোত্রগুলির নাম লেখো।

তোমার বংশে কটি পরিবার আছে হিসাব কর।

জনজাতি ঃ

জনজাতি ভারতীয় সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইংরাজীতে একে ট্রাইব (Tribe) বলা হয়। জনজাতির লোকদের আমরা আদিবাসী বলে জানি।

এরা এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করে। জনজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের এক সাধারণ বংশের বলে মনে করেন। এরা এক সাধারণ ভাষায় কথাবার্তা বলে, মিলেমিশে বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠান পালন করে ও একই রকম কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রত্যেক জনজাতির একজন মুরুব্বী থাকে। সকলেই তার নির্দেশ পালন করে।

আমাদের রাজ্যে বন্ডা, সাঁওতাল, কন্ধ ইত্যাদি জনজাতি দেখা যায়।

ওড়িশায় কোন জনজাতির লোক কোন জেলায় বাস করে তার তালিকা প্রস্তুত কর। যথা—পরজাঃ কোরাপুট।

জনজাতির লোকেরা কয়েকটি কারণে শিক্ষা ও বৈষয়িক জ্ঞানের অভাবে পিছিয়ে আছে। তাদের সংস্কৃতি কিন্তু উন্নত। তাদের নৃত্য, গান, জাতীয় পর্ব পালনের পদ্ধতি থেকে তাদের উন্নত সংস্কৃতি বিষয়ে জানা যায়। আজকাল তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রোজগার প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

তুমি কি জানো ?

- আমাদের রাজ্যে প্রায় ৬২ প্রকার আদিম অধিবাসী সম্প্রদায় দেখা যায়।
- সাঁওতালদের ভাষা সাঁওতালী। সাঁওতালী ভাষার নিজস্ব লিপি আছে।

এই রকম অন্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাম এবং তাদের ভাষার নাম লেখো।

আদিবাসীর নাম	ভাষা
●	●
●	●
●	●
●	●

জনজাতির উন্নতির জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আলোচনা করে লোখো। যেমন ঃ আদিবাসী গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন।

সংঘ ঃ

লক্ষ্য পূরণ করার জন্য লোকেরা নিজের ইচ্ছায় একত্রিত হয়ে কাজ করে। এভাবেই একসঙ্গে মিশে কাজ করলে সংঘ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক সংঘের সার্বজনীন লক্ষ্য থাকে। কিছু নীতি নিয়ম থাকে, যাকে

সংঘের সদস্যরা পালন করে। সংঘ পরিচালনার জন্য একজন সংঘ পরিচালক থাকে। সদস্যরা চাঁদা দিয়ে সংঘের নিজস্ব তহবিল তৈরি করে।

পরিবারের মত সংঘ, চিরস্থায়ী হলে অন্য সংঘগুলি চিরস্থায়ী না হলেও অনেক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

তুমি কি জানো ?

- কার্যভিত্তিক অনেক প্রকার সংঘ তৈরি হয়। এই সংঘগুলির মধ্যে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আর কী কী উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, চিন্তা করে লেখো।
- রক্ত সম্পর্কীয় সংঘ—পরিবার
- ধর্মীয় সংঘ—হিন্দু মহাসভা
- অবসর বিনোদন সংঘ—বিভিন্ন সংগীত নৃত্য অনুষ্ঠান
- বৃত্তিগত সংঘ—উকিল সংঘ
-
-
-

তোমার জানা কয়েকটি সংঘের লক্ষ্য কী তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো। যেমন—রিক্সা চালক সংঘের এক লক্ষ্য হল উপযুক্ত ভাড়া বাবদ অর্থ উপার্জন করা।

সমুদায় / গোষ্ঠী (কমিউনিটি)

একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ঐক্য মনোভাবাপন্ন লোকদের নিয়ে 'সমুদায়' বা গোষ্ঠী গঠিত হয়। ইহা প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি হয়। একই গোষ্ঠীতে বসবাসকারী লোকেরা সর্ববাদিসম্মত জীবনধারা সহযোগী ও সহানুভূতিশীল হয়। গ্রামীণ সমুদায় পৌর সমুদায় ইত্যাদি এর উদাহরণ।

সদস্যদের সমস্ত আবশ্যকতা পূরণ করা গোষ্ঠী বা সমুদায়ের প্রধান লক্ষ্য। এক সমুদায়ের নিবাসীদের মধ্যে প্রথা, পরম্পরা, ধারা ইত্যাদিতে সাদৃশ্য দেখা যায়, সমুদায় নিবাসী অঞ্চলটি ছোট হলে নিবাসীদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়। তবে বৃহৎ 'সমুদায়'-ও কিন্তু লোককে অনেক সাহায্য করে।

তুমি জানো কি ?

- কোনো সংঘ নিজস্ব লক্ষ্য ব্যতীত সর্বসাধারণের উন্নতিমূলক কাজ করলে তার সামূহিক গুণ বৃদ্ধি পায়।
- বর্তমান আমাদের গ্রামগুলির সামূহিক গুণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এ কিন্তু ভাল লক্ষণ নয়।

  এর কারণ নিজে চিন্তা করে সামূহিক সম্পর্ক ও একতা বৃদ্ধির জন্য কী কী করা যেতে পারে লেখো।
-
-
-

ছোট সমুদায়-এ আত্মনির্ভরশীলতা, নিবিড় সম্পর্ক বন্ধুত্ব, আন্তরিকতা দেখা যায়। এবং বৃহৎ সমুদায়গুলি ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় জিনিস যোগানো, সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া অর্থ উপার্জন ক্ষমতা ইত্যাদিপ্রদান করে।

অন্য আর কোন ক্ষেত্রে গোষ্ঠী বা সমুদায় ব্যক্তিকে সাহায্য করে আলোচনা কর।

সমাজ ঃ

আদিম কালের মানুষ স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করত। পরবর্তী সময়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে তাদের ভিতরে কলহ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং মানুষ নীতি নিয়ম তৈরি করে সুখে জীবন কাটাতে চাইল। এই ভাবনা থেকে সমাজ সৃষ্টি হল।

- ১৯৩৮ সালে আমেরিকাতে আন্না নামে একজন পাঁচবছরের মেয়েকে আবিস্কার করা হয়েছিল। ছয়মাস বয়স থেকে তাকে একটি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখছিল। পাঁচ বছর বয়স হলেও সে ঠিকভাবে চলতে বা কথা বলতে পারত না। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেবার পরে সে ধীরে ধীরে কথা বলা ও চলতে শিখল।

সমাজ ছাড়া বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। নিজের প্রয়োজন মত চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ সমাজ সৃষ্টি করে ও তার উপরে নির্ভর করে। সমাজ শৈশবে শিশুকে সহায়তা প্রদান করে। শিশু সমাজের কাছে সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক গুণ শিক্ষালাভ করে। সমাজ ব্যক্তিকে জীবিকা অর্জনে সাহায্য করে ও ব্যক্তি নিজের ধনসম্পদ ও জীবনের সুরক্ষার জন্য সমাজের উপরে নির্ভর করে। ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে নতুন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করে, নিজেকে পরিমার্জিত করে উন্নতি করতে চেষ্টা করে। সমাজে প্রচলিত আদর্শ নীতি ও বিজ্ঞান সম্মত প্রথা সমূহ ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে। ব্যক্তি যেমন সমাজের উপরে নির্ভর করে, তেমনি সমাজও নির্ভর করে ব্যক্তির উপরে। মানুষের উন্নতি হলে সমাজের উন্নতি হয়। চিন্তাশীল ব্যক্তি সমাজে পরিবর্তন এনে একে সমৃদ্ধ করে।

প্রাচীন কালে অপরাধীদের নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হতো কেন ? আলোচনা কর।

আমরা কী শিখলাম ?

- পরিবার হলো ক্ষুদ্রতম সামাজিক অনুষ্ঠান।
  শিশু পরিবারের কাছে বিভিন্ন গুণাবলি শিক্ষা লাভ করে।
- রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এমন সব পরিবার নিয়ে বংশ গঠিত,
  কুল প্রবর্তক ঋষিকে নিয়ে গোত্র সৃষ্টি হয়।
- এক সাধারণ নামাঙ্কিত দেশীয় লোকেদের ক্ষুদ্র সমূহকে জনজাতি বলা হয়।
  তাদের ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, চালচলন জীবিকা অর্জন ইত্যাদিতে সাদৃশ্য দেখা যায়।
- নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কিছু লোক ইচ্ছাকৃতভাবে মিশে সংঘ গঠন করে।

- একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একত্রে বাস করা লোককে নিয়ে 'সমুদায়' বা গোষ্ঠী গঠিত হয়। সর্বসাধারণের বহুবিধ উন্নতি করা এর লক্ষ্য।
- সমাজ বিনা মানুষের স্থিতি অসম্ভব। ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

অভ্যাস

১. **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) ব্যক্তি সমাজের উপরে নির্ভর করে কীভাবে?

খ) পরিবারের কাজ কী?

গ) সমুদায় ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য কী?

ঘ) একই আদিবাসী লোকের মধ্যে কী কী সাদৃশ্য দেখা যায়?

ঙ) বংশ বিভাজনের কারণ কী?

চ) সমাজের উন্নতির উপায় কী?

২. **নিম্নলিখিত সংঘগুলির কার্যক্ষেত্র কী প্রকার ঃ**

পরিবার—

রামকৃষ্ণ মিশন—

প্রাথমিক শিক্ষা সংঘ—

রেডক্রস—

৩. **শূন্যস্থান পূরণ কর।**

ক) ক্ষুদ্রতম সামাজিক অনুষ্ঠান হচ্ছে ————।

খ) সাধারণ লক্ষ্য পূরণের জন্য কিছু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে মিশে ———— গঠন করে।

গ) লোকেদের মধ্যে সম্পর্কীয় ঘনিষ্ঠতা ———— সমুদায়-এ বেশী।

ঘ) সাঁওতাল আদিবাসীর লোকেরা ———— ভাষায় কথাবার্তা বলে।

ঙ) রক্ত সম্পর্কীয় পরিবার নিয়ে ———— গঠিত।

৪. **ঠিক উক্তির কাছে টিক (✓) চিহ্ন ভুল উক্তির নিকটে ক্রশ (X) চিহ্ন দাও।**

ক) একক পরিবারে বাবা, মা, কাকা, কাকী, তাদের ছেলেমেয়ে মিলেমিশে বাস করে।

খ) সমুদায় প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়।

গ) সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির কোনো সম্পর্ক থাকে না।

ঘ) পরিবার থেকে শিশু বিভিন্ন গুণ শিক্ষা লাভ করে।

৫. **সম্পর্ক চিন্তা করে শূন্যস্থান পূরণ কর।**

ক) পুত্র ঃ পিতার গোত্র ঃ ঃ বিবাহিতা কন্যা ঃ—

খ) পরজা ঃ কোরাপুট ঃ ঃ বন্ডা ঃ—

গ) আত্মনির্ভরশীলতা ঃ ক্ষুদ্র সমুদায় ঃ ঃ সামাজিক নিরাপত্তা ঃ—

ঘ) পরিবার ঃ চিরস্থায়ী ঃ ঃ রাজনৈতিক দল ঃ—

তোমার কাজ ঃ

- তোমার গ্রাম অঞ্চলের ক্লাব বা স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠীর প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ওরা কী কী কাজ করে তা বুঝে লেখো।
- তোমার বংশের পূর্বপুরুষের তালিকা কর। প্রয়োজন হলে বাবা ঠাকুর্দার কাছে জেনে নাও।
- টার্জন গল্পের বই পড়েছ। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে কী অসুবিধা হয় লেখো।
- তোমার গ্রাম / ওয়ার্ড-এর একক ও যৌথ পরিবারগুলির তালিকা প্রস্তুত কর এবং পরিবারের প্রধানদের নাম লেখো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

ক্লাসে বইপড়া আরম্ভ হওয়ার আগে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন আচ্ছা বল তো, 'গরিব রথ' কাকে বলে? সঙ্গে সঙ্গে সুমন, সৌরভ ঠিক উত্তর দিয়ে বলল যে, যে-যাত্রীবাহী রেলগাড়িতে কম ভাড়ায় শীততাপ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা রয়েছে তাকে 'গরিব রথ' বলা হয়। এবং ইহা সাধারণত এক রাজ্যের রাজধানী থেকে অন্য এক রাজ্যের রাজধানীতে যাতায়াত করে। উত্তর পেয়ে শিক্ষক ভারি খুশি হয়ে বললেন, ''এই প্রকার রেলের সুবিধা আমাদের জন্য রাষ্ট্র করেছে।''

এই কথা শুনে সুমন, সৌরভ মনে মনে ভাবল, রাষ্ট্র কী? রাষ্ট্র আমাদের জন্য আর কী কী করেছে?

রাষ্ট্রের অর্থ ঃ

রাষ্ট্র রাজনীতি বিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা খুব বেশি, কারণ ইহা সবচেয়ে বড় ক্ষমতাশালী সামাজিক তথা, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান। ইহা এক রাজনৈতিক সংঘ। মানুষ জন্মগ্রহণ করার পর নিজেকে ওই রাষ্ট্রের সভ্য তালিকায় সামিল করে। রাষ্ট্রের সৃষ্টি কবে, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে, মানুষ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়েছে বলে বলা যায়। ইহা সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সংগঠন হওয়ায় ব্যক্তি ও সংঘগুলির বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে।

> **তুমি জানো কি?**
>
> - অ্যারিস্টটলের মতে পরিবার ও গ্রামের সমষ্টিতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি।
> - অধ্যাপক গারনর-এর মতে স্থায়ীভাবে এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী, বাহ্য নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং অধিকাংশ অধিবাসীদের নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য লাভ করা এক সংগঠিত সরকারের অধিকারী কমবেশি লোকদের সম্প্রদায়কে রাষ্ট্র বলে।

রাষ্ট্রের দ্বারাই প্রত্যেক ব্যক্তির উপযুক্ত বিকাশ হয়। কারণ, সাধারণ লোকেদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্র অনেক কল্যাণকারী পরিকল্পনা প্রস্তুত করে কার্যকরী করে। সময়ের পরিবর্তনে রাষ্ট্রের কর্মপদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়। সুস্থ সামাজিক জীবন যাপনের ইচ্ছা প্রত্যেক মানুষের থাকে। এই কারণেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। রাষ্ট্র এক স্থায়ী অনুষ্ঠান হওয়ায় এর প্রয়োজনীয়তা সর্বদা অনুভূত হয়। রাষ্ট্রের নীতি নিয়ম জীবনকে শৃঙ্খলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে। মানুষের ইচ্ছা রাষ্ট্রের মধ্যে থেকেই আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে বলেই একে অত্যাবশ্যক অনুষ্ঠান বলা হয়।

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য / উপাদান

রাষ্ট্রের প্রধানত চারটি উপাদান রয়েছে। সেগুলি হল ঃ ক) জন সংখ্যা, খ) আয়তন, গ) সরকার, ঘ) সার্বভৌমত্ব।

ক) জনসংখ্যা ঃ

রাষ্ট্রগঠনের জন্য অধিবাসী জনসংখ্যা আবশ্যক। কারণ, জনমানবশূন্য মরুভূমি, সাগর ও পশুদের আশ্রয়স্থল জঙ্গলকে রাষ্ট্র বলা যায় না। জনসংখ্যা বিনা রাষ্ট্রের কল্পনা অসম্ভব। জনসংখ্যার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। ইহা চীন ও ভারতের মত জনবহুল রাষ্ট্র কিংবা মোনাকো ও সান্‌মারিনোর মত জন বিরল রাষ্ট্র হতে পারে। তবে প্রকৃতপক্ষে একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা সেই রাষ্ট্রের আয়তন ও সম্বল অনুসারে হওয়া উচিত।

তুমি জানো কি?

- প্লেটোর মতে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৫০৪০ হওয়া দরকার।
- রুশো বলেছিলেন, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১০,০০০ হওয়া দরকার।

খ) আয়তন ঃ

জনসংখ্যার মত প্রত্যেক রাষ্ট্রের এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকা আবশ্যক। তা না থাকলে একটি রাষ্ট্র হতে পারে না। সেজন্য এর নির্দিষ্ট পরিসীমা থাকা দরকার। জল, স্থল, আকাশ, নদী, হ্রদ ও খনিজ পদার্থ নিয়ে একটি রাষ্ট্রেব পরিসীমা নির্ণয় করা হয়। রাষ্ট্রের জন্য ভূসম্পত্তি আবশ্যক হলেও এর সীমা কতদূর হওয়া আবশ্যক তার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। তা রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ও চীনের পরিসীমার মত বড় কিংবা মোনাকো ও সান্‌মারিনোর মত ছোট পরিসীমা হতে পারে।

আয়তন বড় হলে রাষ্ট্রের কী কী সুবিধা হয় বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লিখো।

গ) সরকার ঃ

সরকার রাষ্ট্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। একটি নির্দিষ্ট ভূমণ্ডলের অধিবাসী হলেও সরকার না থাকলে তাকে রাষ্ট্র বলা যায় না। সরকার এক রাজনৈতিক সংগঠন হওয়ায় এর মাধ্যমে রাষ্ট্র নিজের মত প্রকাশ করে ও বিভিন্ন নিষ্পত্তি কার্যকরী করে। সরকারের সাহায্যে রাষ্ট্রের বাস্তবরূপ প্রকাশ পায়। সরকার না থাকলে রাষ্ট্রের কাজকর্ম সুসম্পন্ন হয় না, কারণ সরকার রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা উপভোগ করে। জনসাধারণের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া সরকার আইন দ্বারা পরিচালিত ও শৃঙ্খলিত শাসন প্রতিষ্ঠা করে। সরকার না থাকলে অরাজকতার সৃষ্টি হয়, ফলে রাষ্ট্র তথা সমাজ ও ব্যক্তির স্থিতি বিপন্ন হয়।

ঘ) **সার্বভৌমত্ব ঃ** সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইহা রাষ্ট্রের জীবনীশক্তি। এর বলে রাষ্ট্র অন্য সমস্ত সংঘের চেয়ে পৃথক মনে হয়। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা, যার উপরে আর কোনো ক্ষমতা নাই। সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাষ্ট্র নিজের দেশের নাগরিক, গোষ্ঠী অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনভাবে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে।

তুমি জানো কি?

- সার্বভৌমত্ব (Sovereignity) ল্যাটিন শব্দ সুপরআনস থেকে এসেছে। যার অর্থ হল – সর্বোচ্চ ক্ষমতা।
- সার্বভৌমত্বকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব ও বহিঃ সার্বভৌমত্ব।
- আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব বলে রাষ্ট্র ব্যক্তি, নাগরিক, গোষ্ঠী ও অনুষ্ঠানের উপরে নিয়ন্ত্রণ জারি করে।
- বহিঃ সার্বভৌমত্ব বলে রাষ্ট্র নিজের বৈদেশিক নীতি ও সম্পর্ক নির্ধারণ করে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ ঃ

রাষ্ট্র কবে, কীভাবে উৎপত্তি হল সে বিষয়ে কিছু নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে যা বলা হয় সেগুলি মূলত অনুমান ও কল্পনার উপরে আধারিত এই বিষয়ে নীচে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক প্রাচীন মত রয়েছে। সেই অনুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। একে শাসন করার জন্য ঈশ্বর রাজাকে পাঠিয়েছেন। রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এই মতানুসারে অনেক রাজা অতীতে স্বেচ্ছাচারী হয়ে প্রজাদের অনেক অত্যাচার করেছে।

- খ্রীষ্টধর্মের পুরাতন টেস্টামেন্ট ও হিন্দুধর্মের মনুস্মৃতি ও মহাভারতে ঈশ্বর কর্তৃক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে বলে বলা হয়েছে।
- ঈশ্বর কর্তৃক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। এই মতকে ঐশ্বরিক সৃষ্টি তত্ত্ব বলা হয়।

রাজা স্বেচ্ছাচারী হলে মানুষের কী কী অসুবিধা হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অন্য এক মত অনুসারে শক্তি বা যুদ্ধ দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে বলে বলা হয়। অতীতে কিছু দলের নেতা বল প্রয়োগ করে অন্যদের অধিকার করে নিত। এছাড়াও কিছু শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাদের রাজ্যকে নিজের রাজ্যে মিশিয়ে নিজ রাজ্যের পরিসীমা বাড়াতো। 'জোর যার মুলুক তার' নীতিতে সমাজ পরিচালিত হয়। সুতরাং যুদ্ধ বা শক্তি থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

তুমি জানো কি?

- যুদ্ধ বা শক্তি দ্বারা রাষ্ট্র-সৃষ্টি মতবাদকে শক্তি-তত্ত্ব বলা হয়।
- এই প্রকার প্রথা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল।

পিতা বা মাতার কর্তৃত্বের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি বলে অনেকের ধারণা। এই ধারণা অনুসারে অতি প্রাচীনকালে নানা স্থানে পিতৃকেন্দ্রিক ও মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। পিতা বা মাতা পরিবারের প্রধান ছিলেন। পরিবার থেকে বংশ ও বংশ থেকে গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছিল। এই গোষ্ঠী থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। রাষ্ট্র পিতা বা মাতার কর্তৃত্বের রূপান্তর বলে বলা যায়।

তুমি জানো কি?

- পিতা বা মাতার কর্তৃত্বের রূপান্তরে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। এই মতকে পিতৃশাসিত ও মাতৃশাসিত সিদ্ধান্ত বলা যায়।

তোমার পরিবারে বাবা ও মা কী কী করেন লেখো।

রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কে আরও অনেক মতবাদের কথা জানা যায়। তাঁদের মতে সামাজিক চুক্তি থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। তাঁরা বলেন সৃষ্টির প্রাককালে কোনও সমাজ বা রাষ্ট্র ছিল না। সে কালের আদিবাসীরা সরল জীবনযাপন করত। এই অবস্থাকে মানুষের প্রাকৃতিক অবস্থা বলা হত। পরে তাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয়। তারা 'জোর যার মুলুক তার' নীতি অবলম্বন করতে শুরু করল। যার ফলে তাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। কালক্রমে এই অবস্থা অত্যন্ত অসহ্য হয়ে ওঠায় নিজের ধনজীবন সুরক্ষা ও শান্তিতে বসবাস করার জন্য সামাজিক চুক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র সৃষ্টি করল।

তুমি জানো কি?

- মানুষ চুক্তি করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। এই মতকে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বলা যায়।
- ইংরেজ দার্শনিক হবস্, লক ও ফরাসী দার্শনিক রুশো, সামাজিক মতবাদের সমর্থক।

আবার কেউ কেউ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমবিবর্তনের ফল।

রক্তগত সম্পর্ক ঃ

রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের সম্পর্ক থেকে পরিবারের বৃদ্ধি এবং কালক্রমে বংশ ও গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে। সেই গোষ্ঠী অবশেষে রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।

ধর্ম ঃ বহু প্রাচীনকাল থেকে ধর্মের সাহায্যে ঐক্যভাব সৃষ্টি করে মানুষ এক নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করত। সুতরাং ধার্মিক একতার ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল।

ব্যক্তি ঃ অতীতেশক্তি প্রয়োগ করে কতকগুলি রাষ্ট্র নির্মাণ করা হয়েছিল। রাজারা যুদ্ধের সাহায্যে নিজ রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করত। শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রের স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হত।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঃ

যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে মানুষ এক সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হল। তার সাথে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটল। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল। সুতরাং রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

রাজনৈতিক চেতনা ঃ

রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য রাজনৈতিক চেতনা বা ইচ্ছাশক্তিকে এক প্রমুখ উপাদান রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই চেতনা বা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। সময়ানুসারে মানুষের রাজনৈতিক চেতনার অগ্রগতি ঘটল। এই চেতনার মাধ্যমে সে নিজের মৌলিক অধিকার ও সমাজে নিয়ন্ত্রিত জীবনের মূল্য বুঝতে পারল। রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হল।

সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে বর্তমান সময়ের গণতান্ত্রিক প্রথার মাধ্যমে অনেক রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রের কার্য ঃ

এখন আধুনিক যুগের অধিকাংশ রাষ্ট্র নিজেদের জনকল্যাণ বা জনমঙ্গল রাষ্ট্র বলে মনে করে। সেজন্য তারা জনসাধারণের জন্য অনেক উন্নতিমূলক কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে। একটি জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের কাজকে দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা— (১) বাধ্যতামূলক কাজ (২) ইচ্ছাধীন কাজ।

বাধ্যতামূলক কার্য ঃ

- দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে জনসাধারণের সম্পত্তি ও জীবনের সুরক্ষা দেওয়া।
- দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।
- উপযোগী বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করে অন্য দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা।

তুমি জানো কি?

ব্যক্তির স্থিতি, ব্যক্তির সুরক্ষা ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে কাজ করা হয়, তাকে রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক কার্য বলা হয়।

- মানুষের হিতের জন্য ন্যায়ান্যায় বিচার ব্যবস্থা চালু করা।

ইচ্ছাধীন কার্য ঃ

- শিল্প সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ করা।
- কৃষির আধুনিকীকরণ, জলসেচন ও সমবায় সংস্থার উন্নতি করা।
- অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের যোগান ও বিক্রি।
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম প্রস্তুত করা ও কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।
- যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা।
- অর্থনৈতিক যোজনা দ্বারা মানব সম্বলের উপযুক্ত বিনিয়োগ করা।
- গরিব শ্রেণীর লোকেদের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করা।
- বৃদ্ধ বৃদ্ধা, পিতৃমাতৃহীন ও ভিন্নক্ষমদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা।
- ব্যক্তির অধিকার ইত্যাদির সুরক্ষা করা।

যে কাজ জনসাধারণের কল্যাণের জন্য উদ্দিষ্ট, তাকে ইচ্ছাধীন কার্য বলা হয়।

তোমার অঞ্চলের সরকারের তরফে জনসাধারণের উন্নতির জন্য কী কী কাজ করা হচ্ছে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

জনসাধারণের হিতের নিমিত্ত রাষ্ট্র বহু কার্যক্রম প্রস্তুত করে। ইহা বিভিন্ন সময়ে জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে পৃথক পৃথকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রশিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষার মত অনেক পরিকল্পনার উপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। এই সুচিন্তিত প্রকল্পগুলি সফল রূপায়ণের ফলে জনসাধারণের বহুবিধ উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

আমরা কি জানলাম ?

- রাষ্ট্র রাজনীতি বিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রবিন্দু।
- রাষ্ট্র দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযুক্ত বিকাশ হয়।
- জনসংখ্যা, আয়তন, সরকার ও সার্বভৌমত্ব ঃ এই চারটি উপাদানে রাষ্ট্র গঠিত।
- রাষ্ট্র ঈশ্বর, শক্তি সামাজিক চুক্তি, পিতামাতার কর্তৃত্ব ও ক্রমবিবর্তন-দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে বলে বলা হয়।
- রাষ্ট্রের কাজকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা ঃ (১) বাধ্যতামূলক ও (২) ইচ্ছাধীন।

অভ্যাস

১. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির ৫০টি শব্দে উত্তর দাও।

ক) রাষ্ট্রকে রাজনীতি বিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু বলা হয় কেন ?

খ) রাষ্ট্রকে এক অত্যাবশ্যক অনুষ্ঠান বলার কারণ কী ?

গ) রাষ্ট্র কী কী উপাদান নিয়ে গঠিত ?

ঘ) সার্বভৌমত্বের অর্থ কী ? একে রাষ্ট্র কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ?

ঙ) শক্তি-দ্বারা রাষ্ট্র কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে ?

চ) সামাজিক চুক্তি বলতে কী বোঝায় ? ইহা কেন করা হয়েছিল ?

ছ) ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রগঠনের জন্য কীভাবে প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ?

জ) রাষ্ট্রের কার্যকে কত ভাগে বিভক্ত করা যায় এবং সেগুলি কী কী ?

২. রেখাঙ্কিত পদটি পরিবর্তন না করে বাক্যটি ভুল থাকলে ঠিক করে লেখো।

ক) রাষ্ট্র হল এক বৃত্তিভিত্তিক সংঘ।

খ) মোনাকো একটি জনবহুল দেশ।

গ) সরকার এক ধার্মিক সংগঠন।

ঘ) গোষ্ঠী থেকে পরিবার সৃষ্টি হয়।

ঙ) শিল্প সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক কার্য।

৩. রেখাঙ্কিত পদগুলি বদল করে ভুল থাকলে বাক্যটি সংশোধন কর।

ক) রাষ্ট্র একটি অস্থায়ী অনুষ্ঠান।

খ) সরকার বিভিন্ন প্রথাদ্বারা পরিচালিত হয়।

গ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে সেগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপরে আধারিত।

ঘ) আদিমানব সরল জীবনযাপন করার সময়কে মানুষের কৃত্রিম অবস্থা বলা হয়।

ঙ) ধর্ম দ্বারা অনৈক্য ভাবের উদয় হয়।

চ) দেশের ভিতরে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা এক ইচ্ছাধীন কার্য।

তোমার কাজ ঃ

- তোমার অঞ্চলে সরকারের তরফে গরিব অসহায় লোকেদের উন্নতির জন্য কী কী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে তার উপরে এক বিবরণী প্রস্তুত কর।
- বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার চিত্র সংগ্রহ করে একটি অ্যালবাম প্রস্তুত কর।

সরকার

বিশ্বজিৎ ও মোণিকা ভাই-বোন। মোণিকা বড়, বিশ্বজিৎ ছোট। একদিন সকালে মা তাদের বললেন আজ বাবা ঘরে নেই। তোমরা দুজন বাজার গিয়ে মাছ আনবে। ভাই ও বোন বাজার গেল। রাস্তায় যেতে যেতে বিশ্বজিৎ সুন্দর রাস্তা দেখে এদিক-ওদিক তাকাল ও মোণিকাকে বলল, বোন, আমাদের গ্রামেও এত সুন্দর রাস্তা নাই। এত সুন্দর রাস্তা কে করেছে? মোণিকা বলল, 'সরকার' এ কথা শুনে বিশ্বজিতের মনে প্রশ্ন উঠল—'সরকার!' এ সরকার কে? সে কোথায় থাকে ও কী করে?

সরকার কে?

সরকার রাষ্ট্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ। এর সাহায্যে রাষ্ট্রের শাসনকার্য করা যায়। সরকার রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য নানান পরিকল্পনা যথা ঃ যাতায়াতের জন্য রাস্তা নির্মাণ, রাস্তা মেরামতি, শহর ও গ্রামে বিদ্যুৎ যোগান, লোকেদের চাষ ও ব্যবসার জন্য ঋণ প্রদান, বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি নানাবিধ কার্য করে। এই প্রকল্পগুলি কার্যকরী হওয়ার ফলে জনসাধারণের বহুবিধ উন্নতি সম্ভব হয়।

এছাড়াও সরকার দেশের সীমা সুরক্ষিত রেখে বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে নিজের দেশের উন্নতি করে। এছাড়া সরকার জনসাধারণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য যোগান ব্যবস্থা করে এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ডাক্তারখানা খোলে। সরকার বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যথা—ভূমিকম্প, সাইক্লোন, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সময়ে জনসাধারণের পাশে দাঁড়ায়, সহায়তা

তুমি জানো কি?

সরকারের অনান্য কার্যক্রমগুলি হচ্ছে—

- দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে থাকা লোকেদের জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থা।
- সকলের জন্য কাজ।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলকে সুরক্ষা প্রদান।
- দরদাম নিয়ন্ত্রণ।

তোমার জানা সরকারের অন্যান্য কার্যক্রমের তালিকা কর।

-
-

প্রদান করে ও তাদের ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি রক্ষা করে। এর সঙ্গে আইন অদালতের মাধ্যমে জনসাধারণের বিভিন্ন বিবাদ বিরোধের সমাধান করে সরকার তাদের সুখ-শান্তি ও আনন্দে দিনযাপনের ব্যবস্থা করে।

- বন্যা দুর্ভিক্ষের সময় ওড়িশার বিভিন্ন জেলাতে লোকের অনেক ক্ষতি হয়। এই বিপত্তির সময়ে সরকার জনসাধারণের জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করে। সরকারি সহায়তার জন্য লোকজন বাঁচার সাহস পায় ও বিপদের মোকাবিলা করার সাহস সঞ্চয় করে। সরকার না থাকলে লোককে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করতে হত।

তোমার অঞ্চলে সরকারের তরফে কী কী জনহিতকর কার্য করা হয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

সরকার জনসাধারণের কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করে। যেমন সর্বসাধারণের একত্রিত হওয়ার স্থানে ধূমপান না করা, গাড়ি চালানোর সময় কাছে লাইসেন্স জাতীয় কাগজপত্র রাখা ও হেলমেট মাথায় দেওয়া ইত্যাদির আইন। এই নিয়মাবলী জনসাধারণ পালন না করলে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে আইন অনুযায়ী কার্যানুষ্ঠান করা হয়। দেশে সরকার না থাকলে শান্তিশৃঙ্খলা ব্যাহত হয় ও অরাজকতা দেখা দেয়। যার ফলে দেশের প্রগতি আশানুরূপ হয় না।

সরকার কর্তৃক আর কী কী নীতি নিয়ম প্রণয়ন করে কার্যকরী করা হয়েছে, সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

সরকার বিভিন্ন কাজের সুপরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান, যথা— পোস্ট অফিস, বিদ্যালয়, গোষ্ঠী উন্নয়ন অধিকারীর কার্যালয়, হাইকোর্ট ইত্যাদি গঠন করে। এর মাধ্যমে বিবিধ সরকারী কাজ সফলতার সঙ্গে সরকার কার্যকরী করে জনসাধারণের অশেষ উপকার করে।

উচ্চ ন্যায়ালয়

সচিবালয়

পূর্বের আলোচনা থেকে বিভিন্ন কার্য সরকার দ্বারা সম্পাদিত হওয়ার রাষ্ট্র গঠনের জন্য সরকারের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি তা সহজেই বোঝা যায়। সরকার রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সরকার গঠিত

হয়। এই সরকার বিভিন্ন প্রকারের হয়। যথা— সংসদীয়, রাষ্ট্রপতি সম্বন্ধীয়, ঐকিক রাষ্ট্রীয় রাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সরকার ইত্যাদি।

তোমার অঞ্চলে কী কী সরকারী অনুষ্ঠান আছে তাদের নাম ও তাদের করণীয় কাজের বিবরণ দাও।

সংসদীয় সরকার ঃ

কোনো কোনো দেশে রাষ্ট্র শাসনের জন্য সংসদীয় সরকার আছে। এই সরকারে ব্যবস্থাপিকা ও কার্যপালিকা উভয়ে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সুষ্টুভাবে কাজ করে। এখানে কার্যপালিকা ব্যবস্থাপিকার এক মুখ্য অংশ, কার্যপালিকা ব্যবস্থাপিকার কাছে কাজের কৈফিয়ত দিতে হয়। ব্যবস্থাপিকার সভ্য-বৃন্দ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়। এরা নানাবিধ কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। ভারত ও ইংলন্ডে এই প্রকার সরকার আছে।

তুমি জানো কি?

- সংসদীয় সরকারে রাষ্ট্র মুখ্য আলংকারিক হিসাবে থাকে।
- প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রীমণ্ডল সরকারের শাসনকার্যের প্রকৃত প্রধান।
- প্রত্যেক মন্ত্রীকে নিজের ও নিজ বিভাগের কাজকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও সমূহভাবে সংসদের নিকট জবাব দিতে হয়।

তোমার অঞ্চলের সাংসদেরা কী কী জনহিতকর কাজ করেছেন সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

রাষ্ট্রপতীয় সরকার ঃ

এইরূপ শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র ও সরকার উভয়েরই প্রধান। তার নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতি কার্যপালিকার প্রধান। তিনি জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন সচিবদের নিযুক্তি দিয়ে তাদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

রাষ্ট্রশাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ভোগ করেন। এই শাসনে ব্যবস্থাপিকা ও কার্যপালিকা পৃথক পৃথক ভাবে নিজের কাজ করেন। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর দ্বারা নিযুক্ত সচিবদের ব্যবস্থাপিকার কাছে জবাব দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নাই। যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা, ফ্রান্স, শ্রীলঙ্কা ও ব্রাজিল ইত্যাদি রাষ্ট্রে এই প্রকার সরকার দেখা যায়।

তুমি জানো কি?

- রাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রিত সরকারের রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাপিকার সভ্য নন।
- রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত সচিবরা নিজ নিযুক্তি দাতার নিকটে জবাবদিহি করে থাকেন।
- এই সরকারে ব্যবস্থাপিকা রাষ্ট্রপতির সচিবদের পদচ্যুত করতে পারেন না।

রাষ্ট্রপতি সমস্ত ক্ষমতা উপভোগ করায় কী কী সুবিধা ও অসুবিধা হতে পারে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

ঐকিক সরকার ঃ

যে রাষ্ট্রে সমস্ত ক্ষমতা একটি সরকার বা কেন্দ্র সরকারের উপরে ন্যস্ত থাকে তাকে ঐকিক সরকার বলা যায়। এই প্রকার রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থাকে অধিক ফলপ্রদ করার জন্য রাষ্ট্রকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এই অঞ্চলগুলির জন্য আঞ্চলিক সরকার গঠন করার ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া কেন্দ্র সরকার, আঞ্চলিক সরকারদের তাদের অঞ্চল শাসন নিমিত্ত কিছু ক্ষমতা প্রদান করে ও এই সব সরকার কেন্দ্র সরকারের নির্দেশে শাসন করে। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রে ঐকিক সরকার শাসন প্রচলিত।

তুমি জানো কি?

ইংল্যান্ড, ইটালী, বেলজিয়ম, জাপান, ইরান ইত্যাদি রাষ্ট্রের ঐকিক সরকার শাসন প্রচলিত।

এই প্রকার আর কোন রাষ্ট্রে ঐকিক সরকার শাসন প্রচলিত তথ্য সংগ্রহ করে লেখো।

-
-
-

রাষ্ট্রসংঘীয় সরকার ঃ

রাষ্ট্রসংঘীয় সরকারে দু'প্রকারের সরকার থাকে। রাষ্ট্রস্তরে কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে রাজ্যসরকারগুলি গঠন করা হয়। প্রত্যেক সরকার সে দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে ক্ষমতা উপভোগ করে শাসনকার্য করে। উভয় সরকারই ব্যবস্থাপিকা, প্রশাসনিক ও ন্যায্য ক্ষমতা উপভোগ করে। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ইত্যাদি রাষ্ট্রে এ প্রকার সরকার দেখতে পাওয়া যায়।

তুমি জানো কি?

- সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘীয় সরকার গঠন করা হয়।
- কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের সময় নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা হয়।
- সব সংঘীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা বণ্টন প্রণালী সমান নয়।

গণতান্ত্রিক সরকার ঃ

সবচেয়ে পুরোনো সরকার হচ্ছে রাজতন্ত্র। এই শাসনব্যবস্থায় বংশানুক্রমিকভাবে রাজার প্রথম সন্তানকে রাজা রানী রূপে রাষ্ট্র শাসন করার অধিকার দেওয়া হয়। রাজা রাষ্ট্রের সর্বাধিকারী হন। রাষ্ট্রের সমস্ত আইন রাজা মানতে বাধ্য নন। উপরন্তু এই শাসনব্যবস্থায় রাজার নিষ্পত্তি সকলে মানতে বাধ্য হন।

এছাড়া রাজা আইন তৈরি করে তা কার্যকরী করেন এবং যারা আইন অমান্য করে, রাজা বিচার করে তাদের শাস্তি দেন। গণতন্ত্র

শাসনের মতো লোকেদের কাছে রাজা তাঁর বিভিন্ন কার্যাবলীর উত্তর দিতে বাধ্য নন। প্রাচীনকালে ফ্রান্স ও নেপাল ইত্যাদি রাষ্ট্রে এই প্রকার শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

তুমি যদি রাজা হও, রাজ্যবাসীদের জন্য কী কী কাজ করবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

গণতান্ত্রিক সরকার ঃ অধুনিক যুগে গণতন্ত্রীয় শাসন সবচেয়ে বেশি লোকপ্রিয়। এই শাসন জনসাধারণের শাসন। এই শাসন ব্যবস্থায় সাবালিক নাগরিক স্বাধীনভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ভোট দিয়ে রাজনৈতিক দলের লোকদের মধ্যে তাদের প্রতিনিধি বেছে নেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সরকার গড়ে রাজ্য শাসন করে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়। অধুনা ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা ইত্যাদি রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছে।

তুমি জানো কি?

- গণতন্ত্র (ডেমোক্র্যাসি) শব্দটি দু'টি গ্রীক শব্দ ডেমোস্ ও ক্রাটস্ থেকে এসেছে।
- গণতন্ত্র হচ্ছে গণ-শাসন
- গণতন্ত্র শাসনে সব ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাকে।
- সরকার ঠিকভাবে শাসন না করলে জনসাধারণ সেই সরকারকে বদলে দিতে পারে।
- গণতন্ত্র শাসনে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নির্বিশেষে সবাই সমান সুবিধা সুযোগ ও অধিকার উপভোগ করে।
- আমাদের দেশে ১৮ বছরের বেশি বয়সের মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে।

লোক প্রতিনিধি হিসাবে তোমাকে যদি নির্বাচিত করা হয় তবে তুমি কী কী কাজ করবে লেখো।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে পৃথক পৃথক প্রকারের সরকার শাসন করলেও প্রত্যেক সরকারের কিছু দোষ ও গুণ থাকে। তবুও পরম্পরা ও জনসাধারণের আবশ্যকতা অনুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রত্যেক সরকারের শাসন পদ্ধতি পৃথক পৃথক হয়।

আমরা কী শিখলাম?

- **সরকার রাষ্ট্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ।**
- **রাষ্ট্র শাসনের জন্য সরকার গঠন করা হয়।**
- **সরকারের পরিকল্পিত কাজগুলি হল ঃ**
  - বিভিন্ন যোজনা প্রণয়ন করে কার্যকারী করা।
  - জনহিতকর কার্যক্রম দ্বারা লোকের উপকার করা।
  - প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় লোকের ধনজীবন রক্ষা করা।

- বিভিন্ন নীতি নিয়ম প্রণয়ন করে বাস্তবায়িত করা।
- বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে দেশের প্রগতি সচল করা।
- বিভিন্ন সরকারী অনুষ্ঠান যথা— ডাক্তারখানা, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়, সচিবালয় ও হাইকোর্ট ইত্যাদি স্থাপন করে, সেগুলির সাহায্যে বিভিন্ন লোকহিতকর কাজের ব্যবস্থা করা।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সরকার দেখা যায়। সেগুলি হল ঃ

- সংসদীয় সরকার—ভারত, ইংল্যান্ড
- রাষ্ট্রপতীয় সরকার — যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা, ফ্রান্স
- ঐকিক সরকার—ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড
- রাষ্ট্রসংঘীয় সরকার—ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
- রাজতন্ত্রীয় সরকার—ব্রুনেই
- গণতান্ত্রিক সরকার—ভারত, ইংল্যান্ড

অভ্যাস

১. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর ৫০টি শব্দে দাও—

ক) সরকার কেন গঠন করা হয়?

খ) সরকারের বিভিন্ন জনহিতকর কার্যের উদাহরণ দাও।

গ) সংসদীয় সরকারের লক্ষণগুলি লেখো।

ঘ) রাষ্ট্রপতির সরকার ও সংসদীয় সরকারের মধ্যে এক তুলনাত্মক বিবরণী দাও।

ঙ) 'গণতান্ত্রিক সরকার জনসাধারণের সরকার' বলতে কী বোঝ?

চ) রাষ্ট্রসংঘীয় সরকার ও ঐকিক সরকারের মধ্যে তোমার কোনটি বেশি ভাল লাগে ও কেন ভাল লাগে?

২. নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর একটি কিংবা দুইটি বাক্যে লেখো।

ক) রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকারের নীতি নিয়ম কে প্রণয়ন করে?

খ) ঐকিক সরকারে কার উপরে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়?

গ) রাষ্ট্রপতির সরকারে কার্যপালিকার প্রধান কে?

ঘ) রাষ্ট্রসংঘীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত দুই প্রকার সরকারের নাম লেখো।

ঙ) গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনকার্য কাহার দ্বারা চালিত হয়?

৩. রেখাঙ্কিত পদ / পদগুলি বদলিয়ে ভ্রম সংশোধন কর।

ক) <u>পরিবার</u> হল এক সরকারী অনুষ্ঠান।

খ) সংসদীয় সরকারে <u>কার্যপালিকা</u> ন্যায়পালিকার এক অংশ।

গ) রাষ্ট্রপতীয় সরকারে সচিবদের <u>ব্যবস্থাপিকা</u> নিযুক্ত করে।

ঘ) <u>ইংল্যান্ডে</u> রাষ্ট্রপতির সরকার আছে।

ঙ) ঐকিক সরকারে সমস্ত ক্ষমতা <u>আঞ্চলিক</u> সরকারের উপরে ন্যস্ত থাকে।

চ) রাষ্ট্রসংঘীয় সরকারে <u>তিন</u> প্রকার সরকার থাকে।

ছ) ভারতে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটদাতার কম করে <u>কুড়ি</u> বছর বয়স হওয়া দরকার।

৪. প্রতিটি প্রশ্নের জন্য দেওয়া চারটি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তরটি বেছে লেখো।

(ক) রাষ্ট্র শাসনের জন্য কী গঠন করা হয়?

পরিবার সমাজ

সংঘ সরকার

(খ) আধুনিক যুগে সবচেয়ে বেশি কোন শাসন লোকপ্রিয়?

গণতন্ত্র ঐকিক

রাজতন্ত্র রাষ্ট্রপতীয়

(গ) রাষ্ট্রপতীয় সরকারে রাষ্ট্রের শাসনমুখ্য কে?

ব্যবস্থাপিকা রাষ্ট্রপতি

কার্যপালিকা সচিব

(ঘ) সবচেয়ে প্রচীন শাসনব্যবস্থা কোনটি?

গণতন্ত্র রাজতন্ত্র

সাধারণতন্ত্র লোকতন্ত্র

৫. ঠিক উক্তির কাছে টিক (✓) চিহ্ন ও ভুল উক্তির কাছে ক্রশ (X) চিহ্ন দাও ঃ

ক) সরকার না থাকলে আইনশৃঙ্খলা ব্যাহত হয়।

খ) সংসদীয় সরকারে কার্যপালিকা রাষ্ট্রপতির নিকটে উত্তরদায়ী।

গ) শ্রীলঙ্কায় ঐকিক সরকার আছে।

ঘ) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

ঙ) গণতন্ত্র-শাসন হচ্ছে জনসাধারণের শাসন।

তোমার কাজ :

- তোমার গ্রাম পঞ্চায়েত / পৌরসভাতে সরকারের কী কী কাজ করতে কত অর্থ খরচ করা হয়েছে তার এক বিবরণী প্রস্তুত কর।
- তোমার অঞ্চলের যে কোনো দুটি সরকারী অনুষ্ঠানে গিয়ে তাদের দৈনন্দিন কাজের সম্পর্কে লেখো।

চতুর্থ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

প্রকাশ কিছু কাগজ নিয়ে সুনিতার ঘরে গিয়ে পৌছাল। সুনিতা তখন বাড়িতেই ছিল ও প্রকাশের হাতে এতগুলো কাগজ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল; 'কীরে প্রকাশ, এতগুলো কাগজ কেন ধরেছিস?' প্রকাশ বলল, এ হল আমাদের গ্রামের ভোটদাতাদের তালিকা। জানিস তো, আগামী সোমবার দিন নির্বাচন। কাজেই আমাদের গ্রামেও ভোট হবে। এই ভোটে সরপঞ্চ, সমিতি সভ্য, ওয়ার্ড মেম্বার ও জেলা পরিষদ সভ্য সব নির্বাচিত হবে। আমার হাতে ধরা তালিকা অনুযায়ী তোর বাবা, মা, দাদু, দিদি, সকলে ভোট দিতে পারবে। শোন, তোর দায়িত্ব হল, ওদের সবাইকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাবি সুনিতা হ্যাঁ বলল এবং জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বল তো প্রকাশ, এতজনকে একজন একসঙ্গে কীভাবে ভোট দেবে? আবার ওরা ভোট পেয়ে কী করবে?

স্বায়ত্তশাসন কী?

আমাদের দেশের সর্বোচ্চ শাসনকে কেন্দ্রীয় শাসন বলা হয়। এই শাসনের মুখ্য কার্যালয় দিল্লিতে অবস্থিত। আমাদের রাজ্য ওড়িশা। এর শাসনকে রাজ্য শাসন বলা হয়। এই শাসনের মুখ্য কার্যালয় আছে ভুবনেশ্বরে। আমাদের দেশে প্রায় ছ'লক্ষ গ্রাম ও অনেকগুলি শহর আছে। এগুলি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের পক্ষে অনেক দূর থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে শাসন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং আমাদের দেশের গ্রাম বা শহরে অবস্থিত লোক নিজের উন্নতির দায়িত্ব নিজে বহন করলে এই অঞ্চলের বহুবিধ উন্নতি হতে পারে। গ্রাম বা শহরের লোকরা ব্যক্তিগতভাবে এই দায়িত্ব বহন করতে পারে না; সেজন্য ওরা নিজের প্রতিনিধি বেছে এক জনগোষ্ঠী তৈরি করে। এই জনগোষ্ঠী নিজেকে নিজে শাসন করাকে স্বায়ত্তশাসন বলে। এই শাসনের ফলে লোকে দেশের স্বাধীনতা উপলব্ধি করে ও গণতান্ত্রিক শাসনের বিশেষত্ব বুঝতে পারে।

লোকেরা নিজেদের নিজে শাসন করলে তাদের কী কী সুবিধা হয়, সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

আমাদের দেশের প্রত্যেক লোকের উন্নতির জন্য একেবারে গ্রামের স্তর থেকে যোজনাগুলি স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর থেকে করা হয়। এর মারফৎ জনসাধারণ সরকারকে বিভিন্ন পরামর্শ দিতে পারে। সরকার এই সব পরামর্শের ভিত্তিতে বিভিন্ন যোজনা প্রস্তুত করে স্বায়ত্তশাসন সংস্থার মাধ্যমে কার্যকারী করে জনসাধারণের অনেক উপকার করে।

সরকারের বিভিন্ন যোজনা।

- ৬ থেকে ১৪ বছর শিশুদের পড়ার জন্য বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ।
- সকলের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- রাস্তাঘাট তৈরি ও মেরামতি।
- স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠীকে বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য ঋণ যোগানো ও আর্থিক অনুদান।

তোমার অঞ্চলে কী কী সরকারী পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয়ে মানুষের উন্নতি হচ্ছে তার এক তালিকা কর।

পঞ্চায়েতিরাজ

১৯৫৮ সালে বলবন্তরায় মেহেতা কমিটি এক তিন স্তর বিশিষ্ট স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা প্রচলনের জন্য সুপারিশ করে। এই সুপারিশ অনুসারে গণতন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে নীচুস্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাস্তরে জেলা পরিষদ গঠন করে প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থাকে পঞ্চায়েতিরাজ বলা হয়।

আমাদের দেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল গ্রামাঞ্চল স্বায়ত্তশাসন ও শহরাঞ্চল স্বায়ত্তশাসন। গ্রামাঞ্চল স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ অন্তর্ভুক্ত। শহরাঞ্চল স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মধ্যে পৌর নিগম, পৌরপালিকা (মিউনিসিপ্যালিটি), বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদ (এন.এ.সি) রয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ

প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে গ্রামগুলিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। গ্রামের প্রধান পাঁচ জনকে নিয়ে একটি সভা গঠিত হত। এই সভা গ্রামের ঝগড়াঝাঁটির

মীমাংসা করত। কালক্রমে এই সভাকে পঞ্চায়েত বলা হল। এই পঞ্চায়েত গ্রামের গঠনমূলক কাজের দেখাশুনা করত। ইংরেজরা আমাদের দেশে আসার পরে এই পঞ্চায়েত প্রথাটি অকেজো হয়ে পড়ল। কিন্তু আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পঞ্চায়েত শাসনব্যবস্থা প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার কাজের জন্য একে আরও বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

তুমি জানো কি?

- গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য গ্রামসভা ও পল্লীসভা গঠন করা হয়েছে।
- পঞ্চায়েত আইন অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে।
- আমাদের রাজ্যে বর্তমান ৬,২৩৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে।

তোমার গ্রাম পঞ্চায়েতে ক'টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে সেগুলির নামের তালিকা কর।

গঠন ঃ সাধারণত দু'হাজার থেকে দশ হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট এক গ্রাম বা একাধিক গ্রাম নিয়ে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন সভ্য সেই ওয়ার্ডের সাবালক ভোটারদের দ্বারা সংখ্যাধিক্য ভোটে নির্বাচিত হয়। তাদের ওয়ার্ড মেম্বার বা পঞ্চক বলা হয়। আমাদের রাজ্যে গ্রাম-পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী খুব বেশি হলে ২৫ জন ও খুব কম হলে ১১ জন ওয়ার্ড মেম্বার থাকতে পারে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে হরিজন, আদিবাসী ও মহিলারা ওয়ার্ড সভ্য (ওয়ার্ড মেম্বার) হওয়ার জন্য স্থান সংরক্ষণ করা হয়েছে। নির্বাচিত ওয়ার্ড মেম্বারদের গ্রাম পঞ্চায়েতের সভ্য ও ওয়ার্ড প্রতিনিধি হতে হয়।

তোমার গ্রাম পঞ্চায়েতে কী কী ওয়ার্ড আছে অন্যদের কাছে জেনে তালিকা কর।

-
-
-

প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ বোঝার জন্য একজন পঞ্চায়েত প্রধান থাকে। তিনি সাবালক মতদাতাদের দ্বারা সংখ্যাধিক্য ভোটে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক ওয়ার্ডের নির্বাচিত ওয়ার্ড মেম্বারদের নিয়ে পঞ্চায়েত বসে। পঞ্চায়েতের নির্বাচিত ওয়ার্ড মেম্বারদের থেকে একজনকে (সহকারী) পঞ্চায়েত উপপ্রধান ভাবে নির্বাচিত করা হয়। পঞ্চায়েত প্রধান পঞ্চায়েতের কাজকর্ম পরিচালনা করেন ও তার অনুপস্থিতিতে (সহকারী) উপপ্রধান কার্যনির্বাহ করেন। একটি পঞ্চায়েতের কার্যকাল ৫ বছর। পাঁচ বছর পূর্ণ হলে আবার নির্বাচন করা হয়।

তোমার পঞ্চায়েতে নির্বাচিত প্রধান ও ওয়ার্ড মেম্বারদের নাম জেনে তার একটি তালিকা কর।

এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজকর্ম বোঝার জন্য একজন সম্পাদক থাকেন। তিনি পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে আয়ব্যয়ের হিসাবপত্রও তিনি দেখাশুনা করেন। কোন কোন পঞ্চায়েত তার নিজের চাপরাশী, পাহারাদার, মালি ও কর আদায়কারীদের নিযুক্ত করে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ দু'প্রকার—

১) বাধ্যতামূলক কাজ   ২) ইচ্ছাধীন কাজ

বাধ্যতামূলক কার্য ঃ

- প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরী করা।
- রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- সকলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- পানীয় জল যোগানোর ব্যবস্থা করা।
- নলকূপ ও কুয়া খোঁড়ার ব্যবস্থা করা।
- পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- জন্মমৃত্যুর তালিকা করা।

ইচ্ছাধীন কার্য ঃ

- সমবায় সমিতি গঠন করা।
- পাঠাগার স্থাপন করা।
- মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপন করা।
- দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা।
- মাছ চাষ, মুরগী চাষ ও প্রৌঢ় শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা।

তোমার গ্রাম পঞ্চায়েত কী কী কাজ করেছে তা অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

গ্রামসভা ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সাবালক ভোটার, গ্রাম-পঞ্চায়েতের সব ওয়ার্ড সভ্য ও পঞ্চায়েত প্রধানকে নিয়ে গ্রামসভা গঠিত হয়। এই সভায় প্রধান অধ্যক্ষতা করেন। যদি সভায় পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কার্য যথা— পঞ্চায়েতের পতিত জমি রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে থাকা লোকদের চিহ্নিত করা, বিভিন্ন ভাতা পাওয়ার জন্য যোগ্য লোকেদের তালিকা প্রস্তুত করা ইত্যাদি। এই প্রকার আরও অনেক কাজের যোজনা (scheme) তৈরি করে ঐ সভায় উপস্থাপিত হয় ও তা গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করার জন্য উপরিস্থ সংস্থাকে সুপারিশ করা হয়। এই সভা বছরে দু'বার বসা আবশ্যক।

তোমার গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম সভায় কী কী উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

গ্রাম পঞ্চায়েতের আয় ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজের জন্য ধনরাশি আবশ্যক হয়। এই অর্থরাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি মাধ্যমে পাওয়া যায়। একটি হল তার নিজস্ব আয়, যথা— গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা হাট, পুকুরগুলির নিলাম, গরুর গাড়ি ও রিক্সা ইত্যাদির লাইসেন্স থেকে আয়। অন্য মাধ্যমটি হচ্ছে সরকারী অনুদান। এই অনুদানের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়।

গ্রামসভা ঃ

প্রত্যেক ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য পল্লীসভা গঠন করা হয়। এই সভায় ওয়ার্ডের আবশ্যকীয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা করে প্রয়োজনীয় বাজেট ও কে এই কাজগুলি তদারক করবে এই সব প্রস্তাবগুলি পঞ্চায়েতের কাছে সুপারিশ করা হয়।

তুমি জানো কি?

পঞ্চায়েত প্রধান নিজের কাজে অবহেলা করলে তাকে সরকারী আদেশে কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েতের সভ্যদের দ্বারা অনাস্থা প্রস্তাব এনে ক্ষমতা থেকে নিলম্বন করা যায়।

তোমার গ্রামে কোন লোকেরা ইন্দিরা আবাস পেয়েছে তার এক তালিকা কর।

পঞ্চায়েত সমিতি ঃ

পঞ্চায়েত সমিতির সভ্যরূপে আর কাদের নেওয়া হয় অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখ।

পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তর। প্রত্যেক ব্লকে একটি পঞ্চায়েত সমিতি থাকে। ব্লক অধীনস্থ সব পঞ্চায়েতকে নিয়ে ইহা গঠিত হয়। সাবালক ভোট প্রথার মাধ্যমে প্রত্যেক পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতির জন্য একজন করে সভ্য সভ্যা নির্বাচিত হয়। এদের 'সমিতি সভ্য' বলা হয়। এই সভ্যদের মধ্যে হরিজন আদিবাসী ও মহিলা সভ্য সভ্যাদের আনুপতিক হিসাবে রাখা হয়। এই সভ্যবৃন্দ তাদের মধ্যে একজনকে পঞ্চায়েত সমিতির অধ্যক্ষ (চেয়ারম্যান) ও আর একজনকে উপাধ্যক্ষভাবে নির্বাচিত করে। অধ্যক্ষ পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালনা করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ (ভাইস চেয়ারম্যান) পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহ করেন। ওড়িশাতে এখন ৩১৪টি পঞ্চায়েত সমিতি আছে।

এরা ছাড়া পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত প্রত্যেক পঞ্চায়েতের প্রধান, নগরপালিকা। বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদের অধ্যক্ষ, বিধানসভা, লোকসভা, রাজ্যসভার সদস্যাদের সভ্যভাবে গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সরকারী সভ্যরূপে ব্লক উন্নয়ন অধিকারী (বি.ডি.ও.) শিক্ষা, রাজস্ব, পশুপালন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সব বিভাগ থেকে অধিকারীদের সভ্যরূপে নেওয়া হয়। প্রত্যেক দু'মাসে একবার পঞ্চায়েত সমিতির বৈঠক বসে। পঞ্চায়েত সমিতির কার্যকাল পাঁচ বছরে শেষ হয়ে যায়।

পঞ্চায়েত সমিতির কার্য ঃ

- সরকারের নানাবিধ কার্যক্রমগুলি পঞ্চায়েতের লোকদের সহযোগিতায় কার্যকারী।
- পঞ্চায়েত সমিতির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্যকারী করার জন্য ব্যবস্থা করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বার্ষিক আয়ব্যয়ের বার্ষিক আগাম হিসাব (Budget) প্রস্তুত করা।
- ব্লকস্তরীয় সমস্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ও উন্নতিশীল কার্যানুষ্ঠানগুলি তত্ত্বাবধান করা।
- পঞ্চায়েতগুলির কাজ নিয়ন্ত্রণ করা।

সরকার নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যনির্বাহ করার লক্ষ্য রেখে প্রতি ব্লকে একজন উন্নয়ন অধিকারী (বি.ডি.ও.) নিযুক্ত করে। তাঁর অধীনে সমবায়, মৎস্য চাষ, শিক্ষা, কৃষি, নির্মাণ ও সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ের জন্য একজন করে বিশেষজ্ঞ ও অন্য কর্মচারীদের নিযুক্তি দেওয়া হয়। তাঁরা নিজের বিষয়ে লোকদের বিশেষ পরামর্শ দেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন উন্নতিশীল কার্যক্রমে লোকদের সামিল করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে একজন পঞ্চায়েত কার্য নির্বাহী অধিকারী নিযুক্ত হয়। তিনি লোকদের কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে পরামর্শ দেন। এছাড়া ব্লক ও জনসাধারণের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেন তিনি।

গ্রামসেবকরা পঞ্চায়েত স্তরে আর কী কী কাজ করেন বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

পঞ্চায়েত সমিতির উন্নয়ন

গ্রামাঞ্চলের লোকেদের আর্থিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম ব্লকের মাধ্যমে কার্যকারী হয়। যেমন

- **গ্রামাঞ্চলের লোকেদের আর্থিক সাহায্য কার্যক্রম ঃ** যাদের বার্ষিক আয় দু'হাজার টাকার কম তাদের জীবিকার্জনের জন্য ঋণ দেওয়া। এদের ঋণে শতকরা সত্তর ভাগ ছাড় দেওয়া হয়।
- সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ যাদের বার্ষিক আয় চার হাজার আটশ টাকার কম তাদের জীবিকা অবলম্বনের জন্য ঋণ দেওয়া হয়। এই ঋণ শতকরা তেত্রিশ ভাগ ছাড় দেওয়া হয়।

> - পঞ্চায়েত সমিতির দেওয়া ঋণের টাকার কিছু ভাগ ব্যাঙ্ক থেকে আনা হয়।
> - ঋণের যে অংশ ছাড় দেওয়া হয় তা সরকার বহন করে।

- **জাতীয় গ্রামীণ নিযুক্তি কার্যক্রম এবং গ্রামীণ শ্রমিক নিযুক্তি সৃষ্টি ঃ** এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য দৈনিক কর্ম যোগান ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যায়।
- **প্রধানমন্ত্রীর অর্থ যোগান কার্যক্রম ঃ** যে লোকের বার্ষিক আয় ৪,৮০০ থেকে ৬,০০০ টাকার মধ্যে থাকে তাদের এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিঋণ দেওয়া হয়।

তোমার অঞ্চলে কী কী সরকারী পরিকল্পনা কার্যকারী হয়ে লোকের উন্নতি হচ্ছে তাদের নাম বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

পঞ্চায়েত সমিতির আয় ঃ

পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব আয় নেই। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য সমস্ত অর্থ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায়।

জেলা পরিষদ ঃ

পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার উচ্চতম স্তর হল জেলা পরিষদ। রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় একটি জেলা পরিষদ থাকার ব্যবস্থা আছে। এখন ৩০ টি জেলা পরিষদ ওড়িশায় কাজ করছে। জেলা পরিষদের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ব্যবস্থা করে কার্যকারী করা হয়।

জেলা পরিষদ গঠন ঃ

প্রত্যেক জেলাকে কতকগুলি জেলা পরিষদ জোনে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক জোন থেকে সাবালক ভোট প্রথার মাধ্যমে এক একজন সভ্য নির্বাচিত হয়। তাকে জেলা পরিষদ সভ্য বলা হয়। এই জেলা পরিষদ সভ্যরা তাদের মধ্যে একজনকে অধ্যক্ষ ও আর একজনকে উপাধ্যক্ষভাবে নির্বাচিত করে। পঞ্চায়েত সমিতির মত জেলা পরিষদও সংরক্ষণ ভিত্তিতে আদিবাসী, হরিজন ও মহিলা সভ্য নির্বাচিত হয়। এইসব সভ্যদের নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়। জেলা পরিষদের কার্যকাল সর্বাধিক ৫ বছর।

জেলা পরিষদের অন্য সভ্যবৃন্দ—

- জেলার প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতির অধ্যক্ষ।
- বিধানসভা, লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যবৃন্দ।
- জেলার স্বায়ত্তশাসন সংস্থার অধ্যক্ষ।
- সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি।
- জলার বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

জেলা পরিষদ কার্য ঃ

- জেলাস্তরীয় পরিকল্পনা প্রস্তুতি।
- পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতদের অনুদান প্রদান করা।
- জেলার শিক্ষানুষ্ঠান, সর্বসাধারণের পাঠাগার ও জনকল্যাণকারী সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করা।
- কৃষি, শিল্প, সামাজিক বনসৃজন, পশুপালন, সমবায়, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ, ক্ষুদ্র জলসেচন প্রকল্প, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও প্রৌঢ় শিক্ষার উন্নতি।

জেলা পরিষদ কার্যালয়

তোমার পঞ্চায়েতে জেলা পরিষদের মাধ্যমে কী কী জনহিতকর কার্য করা হচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

জেলা পরিষদের আয় ঃ

জেলা পরিষদ সরকারী অনুদানের উপরে নির্ভর করে। কিছু জেলা পরিষদ বিভিন্ন কর আদায় করে। অন্য কিছু জেলা পরিষদ কিছু থাকার ঘর ও দোকানঘর ইত্যাদি থেকে ভাড়া সূত্রে অর্থ উপার্জন করে।

শহরাঞ্চলের স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা ঃ

ভারতবর্ষ এক গ্রামবহুল দেশ হলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমান ছোট বড় শহর গড়ে উঠেছে। আমাদের ওড়িশায় ভুবনেশ্বর, ব্রহ্মপুর, সম্বলপুর ও রাউরকেল্লা প্রভৃতি শহর গড়ে উঠেছে। এই শহরগুলিতে অনেক লোক বাস করে। কাজেই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা শুধু গ্রামাঞ্চলে সীমাবদ্ধ না থেকে শহরাঞ্চলেও সে ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। শহরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এই স্বায়ত্তশাসন সংস্থা হচ্ছে পৌরনিগম, পৌরপালিকা ও বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদ।

পৌরনিগম ঃ (মহানগর নিগম)

পৌরনিগমগুলি রাজ্য, কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে গঠিত হয়। দিল্লি, কোলকাতার মত ওড়িশার কটক, ভুবনেশ্বর, ব্রহ্মপুর, সম্বলপুর ও রাউরকেল্লার পৌরনিগম মহানগর নিগম গঠন করা হয়েছে।

গঠন ঃ

শহরকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভাগ করে একজন করে প্রতিনিধি প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে নিগম পরিষদে সাবালক ভোট প্রথার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। এদের করপোরেটার বলা হয়। এই করপোরেটারদের মধ্যে কিছু সভ্যপদ আদিবাসী, মহিলা এবং হরিজনদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। নিগমের প্রতিনিধিরা তাদের ভিতর থেকে একজনকে মেয়র ও আর একজনকে ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত করেন। মেয়র নিগমের প্রধান ও নিগম পরিষদের অধ্যক্ষতা করেন। তিনি নিগমের কমিশনার ও সরকারের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেন। তার অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়র নিগমের বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করেন।

- পৌরনিগম—দশ লক্ষের বেশি লোক বাস করা শহরে পৌরনিগম মহানগর নিগম গঠন করা হয়।
- পৌরসংঘ—২৫ হাজারের বেশি লোক বাস করে এমন শহরগুলিতে পৌরসংঘ পুরসভা (মিউনিসিপ্যালিটি) গঠন হয়।
- বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদ দশ হাজারের বেশি লোক যেখানে বাস করে সেই ছোট শহরে বিজ্ঞাপিত অঞ্চল (এন.এ.সি) গঠিত হয়।

পৌরনিগমের কর্ম পরিচালনার জন্য একজন কমিশনার থাকেন। তিনি রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি নিগমের সব বৈঠকে যোগ দেন ও এর কর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন বাজেট প্রস্তুত করে নিগম পরিষদে দাখিল করেন।

পৌরনিগমের কর্পোরেটগণ জন প্রতিনিধি হওয়ায় লোকের কী কী সুবিধা হয়, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখ।

মহানগর নিগমের কার্য ঃ

নিগমের দু'প্রকার কাজ।প্রথম কাজ বাধ্যতামূলক ও দ্বিতীয় কাজ হল ইচ্ছাধীন।

বাধ্যতামূলক কার্য ঃ

- জলের ট্যাংক নির্মাণ ও এর রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- বিদ্যুৎ যোগান ও রাস্তা বিদ্যুতিকরণ।
- জনস্বাস্থ্যের বিকাশ, নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করা, নালা নর্দমা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ।
- রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ, মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- যানবাহন চলাচল ও নিয়ন্ত্রণ।
- ডাক্তারখানা, মাতৃসদন ও শিশুসদন স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, টাকাদান।

পৌরনিগম আর কী কাজ করে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

ইচ্ছাধীন কার্য ঃ—

- গ্রামীণ পাঠাগার, যাদুঘর ও পার্কনির্মাণ।
- বিশ্রামগৃহ, অনাথ আশ্রম নির্মাণ ও পরিচালনা।
- পথপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও সামাজিক বনসৃজন।
- শহরের সব পাকাবাড়ির সার্ভে ইত্যাদি।

পৌরনিগমের আয় ঃ

পৌরনিগম নিম্নলিখিত উপায়ে আয় করে—

- ট্যাক্স থেকে আয় ঃ যানবাহন ও বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে কর আদায়। সম্পত্তি কর, প্রমোদ কর, শিক্ষা কর ও বৃত্তিকর ইত্যাদি।
- ট্যাক্স ব্যতীত আয় ঃ পাকাবাড়ির উপরে কর, লাইসেন্স ফি, যোগাযোগ প্রভৃতি থেকে আয়।
- লাভজনক ব্যবসায় ঃ গোপালন, মুরগি পালন, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি থেকে বাণিজ্য কর আদায়।
- সরকারী অনুদান ঃ সরকারের বিভিন্ন সময়ে দেওয়া অনুদান থেকে আয়।

পৌরনিগম আর কী কী সূত্রে আয় করে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

নিগমের উপরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ

সরকার নিগমের উপযুক্ত পরিচালনার জন্য এর উপরে নিয়ন্ত্রণ জারি করে। কোনো পৌরনিগম সন্তোষজনক কাজ না করলে বা কাজে অবহেলা বা প্রদত্ত ক্ষমতা থেকে অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করলে সরকার সেই নিগম পরিষদ ভেঙে শাসন দায়িত্ব নিজের হাতে রাখতে পারেন।

পৌর সংঘ পুরসভা

২৫ হাজারের বেশি লোক বসবাস করা শহরগুলিতে একটি পুরসভা বা পৌরসংঘ স্থাপিত হাতে পারে। একটি পৌর সংস্থা কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। একটি পৌর সংস্থা কঁটি ওয়ার্ডে ভাগ করা হবে তা শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা ও সরকারের উপরে নির্ভর করে। সাধারণত ওয়ার্ডগুলি এগারো থেকে তিরিশের মধ্যে হয়।

গঠন ঃ

প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে এক একজন ওয়ার্ড সভ্য বা কাউনসিলার নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই কাউনসিলারদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। এছাড়া হরিজন ও আদিবাসীদের সংখ্যা অনুপাতে তাদের জন্য কাউনসিলারের স্থান সংরক্ষিত থাকে। প্রত্যেক ওয়ার্ডের কাউনসিলারদের সেই ওয়ার্ডের ভোটাররা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন। এই নির্বাচিত কাউনসিলাররা পৌর পরিষদ গঠন করেন। কাউনসিলাররা নিজের ভিতর থেকে একজনকে চেয়ারম্যান ও আর একজনকে ভাইস চেয়ারম্যান ভাবে নির্বাচিত করেন।

প্রত্যেক পুরসভার বৈঠক ডাকেন চেয়ারম্যান। তিনি সেই সভার অধ্যক্ষতাও করেন। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান এ কাজ নির্বাহ করেন। পৌর পরিষদের বিভিন্ন নিষ্পত্তি অনুসারে শহরাঞ্চলের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা হয়। পৌর পরিষদের দৈনন্দিন কার্য সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য সরকার একজন বরিষ্ঠ প্রশাসনিক অফিসারকে নিযুক্ত করেন। তাঁকে কার্যনির্বাহী অধিকারী বলা হয়। তাঁর প্রধান কাজ পরিষদের নিষ্পত্তি কার্যকারী করা। এছাড়া তিনি সরকার ও পৌরনিগমের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেন।

পৌর সংঘ পরিচালনার জন্য একজন স্বাস্থ্য অফিসার, একজন পূর্তবিভাগীয় যন্ত্রি, শিক্ষা অধিকারী এমনই অনেক কর্মচারী নিযুক্তি পায়। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নির্মাণ ইত্যাদি বিভাগ কাউনসিলার ও অন্যদের নিয়ে গঠিত হয়। পৌর পরিষদ, স্বতন্ত্র সভা ও কর্মচারীদের নিয়ে পৌরপালিকা গঠিত হয়।

পৌর সংঘে আর কারা কাজ করে অন্যদের কাছে বুঝে লেখো।

পৌর সংঘের কার্য ঃ

পুরসভার কাজ দুই ভাগে বিভক্ত।

(১) বাধ্যতামূলক কাজ ও (২) ইচ্ছাধীন কার্য।

বাধ্যতামূলক কার্য

- গমনাগমন, রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- পানীয় জল যোগান, জল নিষ্কাশন ও আলোর ব্যবস্থা।
- সংক্রামক রোগ নিরাকরণ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা।
- আবর্জনা নিষ্কাশন কম্পোস্ট খাত খনন।
- প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ।
- জন্মমৃত্যু পঞ্জিকরণ।

ইচ্ছাধীন কার্য ঃ

- গৃহ নির্মাণ ও টাউন বাস চালানো।
- আমোদ প্রমোদের জন্য পার্ক তৈরি।
- থিয়েটার ও ক্রীড়া ব্যবস্থা, সিনেমা গৃহ স্থাপন।
- জনগণনা, হাট বাজার ও পাঠাগার স্থাপন।

পৌর নিগম আর কী কী কাজ করে অন্যদের কাছে বুঝে লেখো।

পৌর সংঘের আয়—

পুরসভা নিজের কার্য সম্পাদনের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ সংগ্রহের দুটি উপায়। একটি হল নিজস্ব আয় ও অন্যটি হল সরকারী অনুদান।

নিজস্ব আয় ঃ

পুরসভার অন্তর্গত জমি, ঘর, পাকাবাড়ি ইত্যাদি উপরে কর ধার্য করে অর্থ সংগ্রহ করে।

- পণ্যকর, পায়খানা, আলো ও জলকর ব্যবসায়ও প্রমোদকর আদায় করে।
- যানবাহন যথা—সাইকেল, রিক্সা, গরুর গাড়ি, ট্রলি ইত্যাদি থেকে কর আদায়।

সরকারী অনুদান—

পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকার অনুদান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঋণও দেয়।

পৌর সংঘ আর কী কী উপায়ে আয় করে জেনে লেখো।

বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদ—

যে সব ছোট ছোট শহরের লোকসংখ্যা ১০ হাজারের বেশি সেখানে বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদ (এন.এ.সি) গঠিত হয়। বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদের গঠন, কার্য, আয় ও অন্যান্য ব্যবস্থা পৌরপালিকার গঠন, কার্য ও আয়ের মত হয়। ওড়িশায় ৬৬টি বিজ্ঞাপিত পরিষদ অঞ্চল আছে।

শহরাঞ্চল স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার ফলে লোকেরা নিজের অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা নিজে সমাধান করতে পারছে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারী যোজনাগুলি স্থানীয় লোকের সহযোগিতায় সফল ভাবে কার্যকারী হয়ে দেশে প্রগতির পথ ত্বরান্বিত করছে।

আমরা কী শিখলাম ?

- জনগোষ্ঠী নিজেকে নিজে শাসন করাকে স্বায়ত্তশাসন বলা হয়।
- স্বায়ত্তশাসন এর মাধ্যমে বিভিন্ন যোজনা স্থির করে সরকারকে প্রস্তাব দেওয়া হয়।
- স্বায়ত্তশাসন সংস্থা দ্বারা সরকার বিভিন্ন লোকহিতকর যোজনা কার্যকারী করে জনসাধারণের অনেক উন্নতি সাধন করে।
- পঞ্চায়েতিরাজ শাসনব্যবস্থার দ্বারা রাজ্যে ত্রিস্তরীয় শাসন ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে।
- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—গ্রামাঞ্চল স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ও শহরাঞ্চল স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ গ্রামাঞ্চল স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ও এগুলি গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের নানাবিধ উন্নতি সাধনে সদা তৎপর থাকে।
- পৌরনিগম পৌর সংঘ ও বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদ শহরাঞ্চল স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ও এগুলি শহরাঞ্চল জনসাধারণের বহুবিধ উন্নতি সাধনে তৎপর থাকে।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের মুখ্য হল প্রধান ও তিনি লোকেদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। গ্রাম পঞ্চায়েত দুই ভাবে কাজ করে। বাধ্যতামূলকভাবে ও ইচ্ছাধীনভাবে।
- পঞ্চায়েত সমিতির মুখ্য হলেন চেয়ারম্যান (অধ্যক্ষ), তিনি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।
- জেলা স্তরে জেলা পরিষদ গঠন করা হয় এবং জেলা পরিষদের প্রধানকে সভাপতি (অধ্যক্ষ) বলা হয়।
- মহানগর নিগমের প্রধানকে মেয়র বলা হয়। পৌরসংঘ ও বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদের প্রধান হলেন চেয়ারম্যান। এই সংস্থার প্রধানরা জনসাধারণের মারফৎ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।
- পৌরনিগম, পৌরসংঘ পালিকা, বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদ শহরের প্রভুত উন্নতি সাধনের জন্য ক্ষিপ্রগতিতে কার্য সম্পন্ন করে।

অভ্যাস

১. **প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ**

ক) স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ ? ইহা কেন করা হয়েছে ?

খ) মেহেট্টা কমিটি সরকারকে কী সুপারিশ করেছিল ?

গ) পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা কাকে বলে ?

ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত কীভাবে গঠন হয় লেখো।

ঙ) গ্রাম সভা কীভাবে গঠিত হয় ?

চ) পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কীভাবে নির্বাচিত হন ?

ছ) জেলা পরিষদ কীভাবে গঠিত হয় ?

জ) জেলা পরিষদ কী কী কাজ করে ?

ঝ) শহরাঞ্চল স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় কোনগুলি অন্তর্ভুক্ত ?

ঞ) মহানগর নিগম কীভাবে গঠন করা হয় ?

ট) মহানগর নিগমের (পৌরসভা) কোনগুলি বাধ্যতামূলক কাজ ?

ঠ) পৌরসংঘ কী কী উপায়ে আয় করে ?

২. **বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ সংখ্যা বেছে শূন্যস্থান পূবণ কর।**

ক) আমাদের দেশ শাসনের মুখ্য কার্যালয় ————তে আছে।
(মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লি, কলকাতা)

খ) বলবন্ত রায় মেহেট্টো কমিটি ———— সালে তিন স্তর বিশিষ্ট স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য সুপারিশ করেছিল।
(১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০)

গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকাল ———— বছর।
(৩, ৪, ৫, ৬)

ঘ) গ্রাম সভা ————র সভাপতিত্বে বসে।
(ওয়ার্ড মেম্বার, নায়েব সরপঞ্চ, পঞ্চায়েত প্রধান, সমিতি সভ্য)

ঙ) ব্লকের দৈনন্দিন কাজকর্ম বোঝার জন্য সরকার ————কে নিযুক্তি দেয়।
— — — —

চ) জেলা পরিষদের কার্যকাল ———— বছর।
(৪, ৫, ৬, ৭)

ছ) দশ লক্ষের বেশি লোকসংখ্যা হলে শহরে ———— প্রতিষ্ঠা করা হয়।
(জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত, মহানগর নিগম, পৌর পরিষদ)

জ) পৌর সভ্যকে ———— বলা হয়।
(সমিতি সভ্য, কাউনসিলার, ওয়ার্ড মেম্বার, প্রধান)

৩. নীচে দেওয়া উত্তরগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক তার পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

ক) গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের জন্য লোক সংখ্যা কত হওয়া দরকার ?

২,০০০ থেকে ১০,০০০ | ৩,০০০ থেকে ৬,০০০
৪,০০০ থেকে ৫,০০০ | ৫,০০০ থেকে ৬,০০০

খ) শহরাঞ্চল স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় রয়েছে ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েত | পঞ্চায়েত সমিতি
জেলা পরিষদ | মহানগর নিগম

গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বাধ্যতামূলক কার্য হচ্ছে ঃ

কূপ খনন | মাছ চাষ
সমবায় সমিতি গঠন | পাঠাগার নির্মাণ

ঘ) পঞ্চায়েত সমিতির বৈঠক বসে ঃ

দু'মাসে একবার | চার মাসে একবার
তিন মাসে একবার | পাঁচ মাসে একবার

ঙ) জেলা পরিষদের কার্যকাল ঃ

৪ বছর | ৬ বছর
৫ বছর | ৭ বছর

চ) এক লক্ষের বেশী সংখ্যক লোকের বাসস্থান শহরে গঠন করা হয় ঃ

জেলা পরিষদ | মহানগর নিগম
পৌরসংঘ | বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদ

৪. ভুল থাকলে ঠিক কর ঃ

ক) জনসাধারণ নিজের প্রতিনিধি বেছে রাজ্যগোষ্ঠী তৈরি করে।
খ) ওয়ার্ডের সভ্যকে জেলা পরিষদের সভ্য বলা হয়।
গ) পঞ্চায়েত প্রধান পঞ্চায়েতের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখেন।
ঘ) পঞ্চায়েত সমিতির অধ্যক্ষ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হন।
ঙ) জেলা পরিষদের মুখ্যকে পঞ্চায়েত প্রধান বলা হয়।
চ) মহানগর নিগমের কার্য পরিচালনার জন্য বি.ডি.ও থাকেন।
ছ) পৌরসংঘের ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত সভ্যকে ওয়ার্ড মেম্বার বলা হয়।

তোমার কাজ ঃ

- তোমার গ্রাম পঞ্চায়েতে গত এক মাসে কী কী কাজ করা হয়েছে ও কত খরচ করা হয়েছে, তার এক বিবরণী প্রস্তুত কর ।
- তুমি যে ওয়ার্ডে আছ সেই ওয়ার্ডে কী কী কাজ হয়েছে তার এক তালিকা প্রস্তুত কর ।